বিজ্ঞানিকা

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গু



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ্ প্রবর্তিত মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক
বিদ্যালয়সমূহের **অবশ্যপাঠ্য বিজ্ঞানের ষষ্ঠ শ্রেণীর**
নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত

[*Vide Notification No. Syl. 1/62, dated 30. 3. 62.*]

বিজ্ঞানিকা

১

[নব পর্যায়]

মাধ্যমিক উচ্চতর মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক
বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, এম্. এস্-সি., ডি. ফিল্., ডব্লিউ. বি. ই. এস্.
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ্রিফিথ মেমোরিঅ্যাল' পুরস্কারপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক, মৌলানা আজাদ কলেজ, কলিকাতা
[রাজসাহী, প্রেসিডেন্সী এবং হুগলী মহসীন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৬২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৩
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ : মে, ১৯৬৩
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী, ১৯৬৪

মূল্য : ১·২৫ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা ৬

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

(For both Class X and Class XI Schools)

CLASS VI

Objectives: 1. To produce a general awareness of the common natural phenomena in relation to human life.

2. To develop power of observation of objects and phenomena around us.

Course contents	*Demonstration & Experiments*
A. NON-LIVING: The Earth (1) Above the earth's surface: Atmosphere, air, water-vapour; clouds, wind, storm; thunder and lightning; rain, hail snow, dew, fog, mist; monsoon, air becomes cooler higher up in the hills (snow on mountain tops), in aeroplanes, air becomes less dense higher up; difficulty in breathing on mountains. (These topics should be treated mainly in a descriptive manner.)	Experiments to show that air contains water-vapour, air supports breathing; observations of sky and atmosphere in different seasons; direction of wind.
(2) Below the earth's surface	
(a) Minerals—coal, iron, oil—their origin (theory not required).	Demonstration with charts and diagrams.
(b) Water—wells and tube-wells.	
(3) All objects are attracted by the earth: deduction from the common experience of falling bodies.	
(4) Beyond the earth.	
(i) Heavenly bodies: The simple idea of solar system—the sun, planets, the satellites especially the moon. Difference between Planets and Stars. The sun as a source of heat and light—variation of heat in different seasons.	Charts, diagrams and observations.
B. LIVING BEINGS.	
I. Difference between living and non-living.	
(1) A living thing feeds; it persists though it is ever changing.	Observation of plants, trees, branches, leaves, flowers, seeds, leaves fall off and new ones grow again. Feeding of plants and animals.

(2) A living thing breathes: if air is cut off both plants and animals die (even fish needs air).

Show effect on plants and animals when air is not renewed.

(3) Living things produce living things; seed changes to plants and plants produce seeds, eggs-hens-eggs.

(4) Living things react to their surroundings and are affected by them.

(a) Plants react to light, temperature, gravity and water.

(b) Animals also react to what they see, hear, smell and test.

To show examples around you, as plants turn to light, climbing plants coil round supports, roots spread out towards moistsome soil, leaves and flowers close up at night, behaviour of earth-worm and house-fly.

II. Difference between plants and animals:

(1) Animals and plants require different kinds of food materials.

Points of difference to be illustrated by suitable examples.

(2) Animals have usually a definite size and shape, whereas plants grow in all directions.

Compare an animal with a tree.

III. Some useful plants and animals: (Indicate the use of the following).

(1) Plants providing materials for food, clothing and dwelling; Rice, wheat, potato, onion, radish, pea, palang, gourd, cauliflower and cabbage, mango, guava, pine-apple, jack-fruit, tomato, cocoanut, orange; cotton, jute and timber.

These points should be illustrated by suitable examples from everyday life and actual specimens should be demonstrated wherever possible.

(2) Animals providing materials for food, clothing, hide:
fish, goat, duck, hen, sheep, cow.

Animals work for man:
Bullock, horse, elephant.

সূচীপত্র

(2) A living thing breathes: if air is cut off both plants and animals die (even fish needs air).	Show effect on plants and animals when air is not renewed.
(3) Living things produce living things; seed changes to plants and plants produce seeds, eggs-hens-eggs.	
(4) Living things react to their surroundings and are affected by them. (a) Plants react to light, temperature, gravity and water. (b) Animals also react to what they see, hear, smell and test.	To show examples around you, as plants turn to light, climbing plants coil round supports, roots spread out towards moistsome soil, leaves and flowers close up at night, behaviour of earth-worm and house-fly.

II. Difference between plants and animals:

(1) Animals and plants require different kinds of food materials.	Points of difference to be illustrated by suitable examples.
(2) Animals have usually a definite size and shape, whereas plants grow in all directions.	Compare an animal with a tree.

III. Some useful plants and animals:
(Indicate the use of the following).

(1) Plants providing materials for food, clothing and dwelling; Rice, wheat, potato, onion, radish, pea, palang, gourd, cauliflower and cabbage, mango, guava, pine-apple, jack-fruit, tomato, cocoanut, orange; cotton, jute and timber.	These points should be illustrated by suitable examples from everyday life and actual specimens should be demonstrated wherever possible.
(2) Animals providing materials for food, clothing, hide: fish, goat, duck, hen, sheep, cow. Animals work for man: Bullock, horse, elephant.	

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পর্ব—জীবের কথা

প্রথম পর্ব

জড়-পদার্থের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

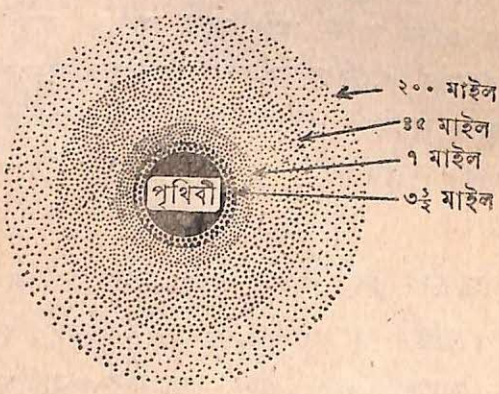
পৃথিবীর কথা—ভূপৃষ্ঠের ঊর্ধ্বে

বায়ুমণ্ডল

একটা গেলাসে খানিকটা জল রয়েছে, বাকিটা খালি। ঘরের মধ্যে লোকজন আছে, আসবাবপত্র আছে, বাকিটা খালি, মনে হয় কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওসব জায়গা খালি নয়। গেলাসে জল ছাড়া বাকি অংশটুকুতে আছে বায়ু, ঘরের মধ্যেও লোকজন, আসবাবপত্র ছাড়া বাকি অংশটুকুতে আছে বায়ু। আমাদের চারদিকে, ভূপৃষ্ঠের উপরদিকে বহুদূর অবধি বিস্তৃত রয়েছে বায়ু, আমরা বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। এই পৃথিবীর চারদিকে বায়ুর যে আবরণ আছে তার নাম বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর আকর্ষণে ইহা পৃথিবীর সঙ্গে লেগে রয়েছে।

বায়ুর গন্ধ নেই এবং কোনো রঙও নেই। যদিও চোখে দেখে আমরা বায়ুর অস্তিত্ব বুঝতে পারি না, তবু নানাভাবে আমরা বুঝতে পারি যে বায়ু আছে। ঝড়-ঝাপটার সময় বায়ু প্রবাহিত হয়, আমরা স্পর্শদ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার বায়ু যখন স্থির, তখন একটা পাখা নাড়লেই বুঝতে পারি যে আমরা বায়ুর মধ্যেই ডুবে রয়েছি।

পৃথিবীর উপরে পর পর বায়ুর অনেকগুলো স্তর আছে। উপরের বায়ুস্তর নীচের স্তরের উপর ক্রমাগত চাপ দেয়, সেজন্য ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন। যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর তত পাতলা। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩½ মাইল (৫·৬ কিলোমিটার) অবধি বায়ুস্তর এত ঘন যে সেখানে স্বচ্ছন্দে শ্বাসক্রিয়া চালানো যায়। এর উপরে ৭ মাইল (প্রায় ১১ কি. মি.) পর্যন্ত বায়ুস্তর ক্রমশ এত পাতলা হ'য়ে গেছে যে, অক্সিজেনের অভাবে সেখানে শ্বাসক্রিয়া চালানো কঠিন হ'য়ে পড়ে। আরও উপরে ৪৫ মাইল (৭২ কি. মি.) অবধি যে স্তর, সেখানে বায়ুর পরিমাণ আরও কম। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রায় ২০০ মাইল (৩২০ কি. মি.) অবধি বায়ুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্তরে আছে হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস। অনেকের অনুমান, এর বিস্তার উপরদিকে প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত।



চিত্র ১—পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে যতই উপরদিকে ওঠা যায়, বায়ু ততই

হালকা ও শীতল হ'তে থাকে। এজন্য শিলং, দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি উঁচু পাহাড় অঞ্চল শীতপ্রধান হ'য়ে থাকে। বেশি উঁচু পর্বতে উষ্ণতা এত কম যে বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় জমে বরফ হ'য়ে যায়। এজন্য দেখা যায়, হিমালয়ের মতো উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় সবসময়ই তুষার জমে থাকে। এ থেকেই বুঝবে, পাহাড়ের চূড়ায় কিরূপ ঠাণ্ডা! একটা এরোপ্লেনে ক'রে বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব প্রদেশে উঠলেও বোঝা যায় যে, উষ্ণতা ক্রমশ কমে গেছে।

বায়ুর উপাদান

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—প্রদীপ, মোমবাতি, কাঠ—এসব জ্বলে। একটা প্রদীপ যত জ্বলছে, তার তেল তত কমে যাচ্ছে। এমনি ক'রে যখন তেল একেবারে ফুরাবে তখন প্রদীপও নিভে যাবে। তেল ফুরালে যেমন প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি বায়ুর অক্সিজেন ফুরালেও প্রদীপ জ্বলতে পারে না।

একটা পরীক্ষা কর। একটা পাত্রে দু'টি মোমবাতি জ্বেলে বসিয়ে দাও। এখন পাত্রে খানিকটা জল ঢেলে তার উপর একটা বড় কাচের জার চাপা দাও, যাতে জারের মুখটা জলের নীচে ডুবে থাকে। একটু পরে দেখবে, বাতি দু'টি নিষ্প্রভ হ'য়ে তারপর নিভে যাবে এবং পাত্রের ভেতরের জল বাইরের জল-সমতল থেকে উপরে উঠে যাবে। পাত্রের জলে একটু কস্টিক পটাশ দিয়ে তারপর জল ঢেলে বাইরের এবং ভেতরের জল-সমতল এক ক'রে নিলে দেখবে, জারের মধ্যে পাঁচভাগের চারভাগ গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে এবং একভাগ জলে ভর্তি হ'য়ে গেছে। দহনের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় তা কস্টিক পটাশ দ্রবণে গুলে যায় ব'লে এরকম হয়। আর একটা কথা, রাসায়নিক সংযোগের ফলে যতটা অক্সিজেন কমে

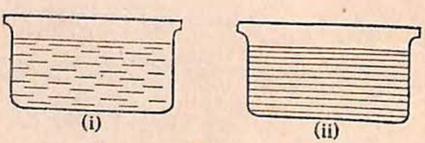
যায় ঠিক ততটা জল জারের মধ্যে ঢোকে। এতে প্রমাণিত হ'ল, বায়ুর পাঁচভাগের একভাগ অক্সিজেন।



চিত্র ২—আয়তন হিসেবে বায়ুর একভাগ অক্সিজেন এবং চারভাগ নাইট্রোজেন

জারে যে অবশিষ্ট চারভাগ গ্যাস পড়ে রইল, তার মধ্যে প্রদীপ, মোমবাতি বা কাঠি কিছুই জ্বলে না। এই গ্যাসের প্রায় সবটাই নাইট্রোজেন। এতে বোঝা গেল, বায়ুর প্রধান উপাদান দু'টি—অক্সিজেন (একভাগ) ও নাইট্রোজেন (চারভাগ)। অক্সিজেন দহনে সহায়তা করে, কিন্তু নাইট্রোজেন দহনে সহায়তা করে না।

কার্বন ডাই-অক্সাইড—এবারে একটা কাচের ডিসে খানিকটা পরিষ্কার চুনের জল নিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দিলে



চিত্র ৩—(i) পরিষ্কার চুনের জল (ii) বাতাসের সংস্পর্শে থেকে চুনের জল ক্রমশ ঘোলা হ'য়ে যাচ্ছে

দেখবে, তার উপর ধীরে ধীরে একটা সাদা সর পড়েছে আর চুনের জল ক্রমশ ঘোলা হ'য়ে যাচ্ছে। চুনের জলের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাকে ঘোলা ক'রে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিশেষত্ব। কাজেই বোঝা গেল, বাতাসে এই গ্যাসটিও অল্প পরিমাণে আছে।

জীবের শ্বাসক্রিয়ার ফলে এবং আমাদের আশেপাশে যা-কিছু জ্বলছে তা থেকেই এই গ্যাস তৈরি হ'য়ে অবিরত বাতাসে মিশে যাচ্ছে।



চিত্র ৪

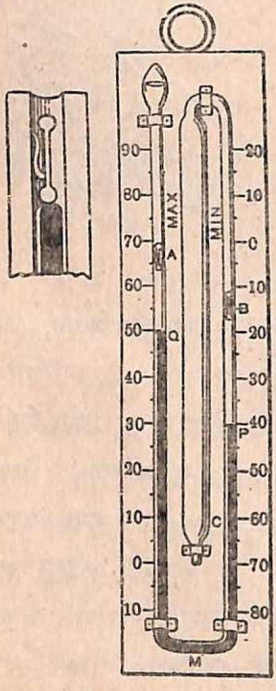
জলীয় বাষ্প—একটি গেলাসে ক'রে বরফ-জল রেখে দিলে তার গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে, এতে বোঝা যায় বাতাসের সঙ্গে খানিকটা জলীয় বাষ্পও মিশে রয়েছে।

বায়ু একটি মিশ্রণ—বায়ু একটি মিশ্রণ, অর্থাৎ এর উপাদান-গুলো সাধারণভাবে মিশে আছে। বায়ু যে একটা মিশ্রণ, তার অনেক প্রমাণ আছে। নানারকম প্রক্রিয়ায় বায়ুর উপাদানগুলো সহজেই পৃথক্ করা যায়। উপাদানগুলোর পরিমাণ সবসময় নির্দিষ্ট থাকে না। সাধারণ বায়ুর চেয়ে সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ের উপরে বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। আবার বড় বড় শহরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি উপাদানগুলো বায়ুতে যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে মিশিয়ে যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাতে তাপের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং এই কৃত্রিম বায়ুর ধর্ম সবদিক দিয়ে বায়ুর মতোই হয়।

আবহাওয়ার কথা

বায়ুর উষ্ণতা—আবহাওয়ার কথা জানতে হ'লে প্রতিদিনই বায়ুর উষ্ণতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দরকার হয়। উষ্ণতা মাপার জন্য থার্মমিটার বা তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে

'সেন্টিগ্রেড স্কেল' অথবা 'ফারেনহাইট স্কেল' অনুযায়ী দাগ কাটা থাকে। সাধারণ অবস্থায় বরফ জমে ০° সেন্টিগ্রেড অথবা ৩২° ফারেনহাইট উষ্ণতায়, আর জল ফোটে ১০০° সেন্টিগ্রেড অথবা ২১২° ফারেনহাইট উষ্ণতায়। এ-থেকেই ছ'রকম স্কেলের পার্থক্য বোঝা যাবে।



সিক্স-এর চরম এবং অবম থার্মমিটার

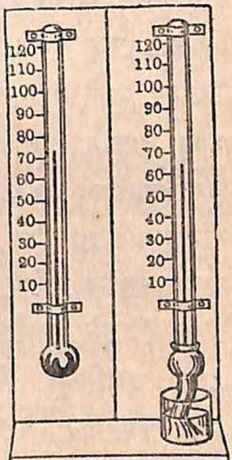
চিত্র ৫

বায়ুর উষ্ণতা প্রতিমুহূর্তেই বদলাচ্ছে। কাজেই বায়ুর উষ্ণতা সবচেয়ে উঁচুতে কতটা উঠেছিল কিংবা সবচেয়ে নীচে কতটা নেমেছিল তা সঠিকভাবে জানতে হ'লে একজনের ক্রমাগত প্রতিসেকেণ্ড অন্তর অন্তর বায়ুর উষ্ণতা মাপা দরকার, কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব কাজ। বিজ্ঞানীরা তাই এজন্য একটা বিশেষ ধরনের থার্মমিটার ব্যবহার করেন; এর নাম **সিক্স-এর চরম এবং অবম থার্মমিটার**। এই থার্মমিটারের ছ'টি বাহুতে ছ'টি সূচক থাকে, বাঁদিকের সূচকের নিম্নাংশ এবং ডানদিকের সূচকের নিম্নাংশ কোথায় আছে তা দেখে গত ২৪ ঘণ্টার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার খবর জানা যায়।

বায়ুর আর্দ্রতা—একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে তার নীচে উত্তাপ দিতে থাক। কিছুক্ষণ পরে জল ফুটতে থাকবে এবং বাষ্পে পরিণত হবে। উত্তাপ যত বেশি হয় বাষ্পীভবনের মাত্রাও তত

বেড়ে যায়, এবং তা সবচেয়ে বেশি হয় যখন জল ফুটতে থাকে। প্রখর সূর্যের তাপে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতির জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হ'য়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায় ব'লে গ্রীষ্মকালে নদ-নদী, খাল-বিল শুকিয়ে আসে।

একটা পাত্রে কিছু জল নিয়ে তাতে অল্প অল্প ক'রে নুন দিয়ে নাড়তে থাক। প্রথমে নুন সহজেই গুলে যাবে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখবে, নুন আর গুলছে না, নীচে এসে জমা হচ্ছে। ঐ জলটুকুর পক্ষে যতটা নুন দ্রবীভূত করা সম্ভব তা করেছে। একে **সংতৃপ্ত দ্রবণ** বলে। তখন দ্রবণটি উত্তপ্ত করলে তা আরও নুন দ্রবীভূত করতে পারবে, কিন্তু উষ্ণতা কমিয়ে দিলে সেই অতিরিক্ত নুন আবার জল থেকে স্ফটিকের আকারে বেরিয়ে নীচে জমবে। এতে বোঝা গেল, উষ্ণতা বাড়লে নির্দিষ্ট পরিমাণ জলে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার কমে।



বায়ুর আর্দ্রতা-মাপক যন্ত্র
চিত্র ৬

একটা গেলাসে খানিকটা বরফ-জল রেখে দিলে দেখবে, তার গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমেছে (চিত্র ৪ দ্রষ্টব্য)। এতে প্রমাণ হ'ল, বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে। গরম বাতাস যতটা জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে, ঠাণ্ডা বাতাস ততটা পারে না, অর্থাৎ গরম বাতাসকে সংতৃপ্ত করতে যতটা জলীয় বাষ্প দরকার তার চেয়ে অনেক কম বাষ্পেই ঠাণ্ডা বাতাস সংতৃপ্ত হ'য়ে যায়। কাজেই গরম বাতাস ঠাণ্ডা গেলাসের গায়ে লেগে ঠাণ্ডা হ'লে তার জলীয় বাষ্প ধারণ করার শক্তি কমে যায়; তার ফলে খানিকটা বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে জলবিন্দুরূপে গেলাসের গায়ে জমা হয়।

জলীয় বাষ্প যেন বাতাসে দ্রবীভূত হ'য়ে রয়েছে। কাজেই উষ্ণতা অনুসারে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ করবার শক্তির তারতম্য হয়। গ্রীষ্মকালের গরম বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে, আবার শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হয় কম। বর্ষাকালের বাতাস আর্দ্র, কারণ এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ বললে বোঝা যায়, যতটুকু জলীয় বাষ্প থাকলে বাতাস সংতৃপ্ত হ'ত, তার শতকরা ৯৫ ভাগ জলীয় বাষ্প সেদিন বাতাসে আছে। আর্দ্রতা-মাপক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাপ করা যায়।

শিশির—হেমন্তে ও শীতে ভোরবেলা ঘাস ও গাছের পাতায় জলবিন্দুর আকারে প্রচুর শিশির জমা হ'য়ে থাকে। সূর্যকিরণে শিশির যেন মুক্তোর মতো ঝকঝক করে। দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে মাটি, পাথর, গাছপালা ইত্যাদি গরম হয়, কাজেই ভূ-সংলগ্ন গরম বাতাস জলীয় বাষ্পে অসংতৃপ্ত অবস্থায় থাকে। রাত্রিবেলা ভূপৃষ্ঠের ঐসব বস্তু তাপ বিকিরণ ক'রে ঠাণ্ডা হ'লে সেইসঙ্গে ভূ-সংলগ্ন বাতাসও ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। এভাবে ঠাণ্ডা হবার ফলে শীতল বাতাস ক্রমশ জলীয় বাষ্পে সংতৃপ্ত হ'য়ে পড়ে এবং বাতাস আরও ঠাণ্ডা হ'লে কিছুটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়। এসব জলবিন্দুই শিশির-রূপে মাটি, পাথর, ঘাস-পাতা ইত্যাদির উপর জমা হয়। যে জিনিস তাপ বিকিরণ ক'রে যত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়, তার উপর তত বেশি শিশির জমে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকলে, আকাশে মেঘ না থাকলে এবং বায়ুপ্রবাহ না থাকলে শিশিরপাত বেশি হয়।

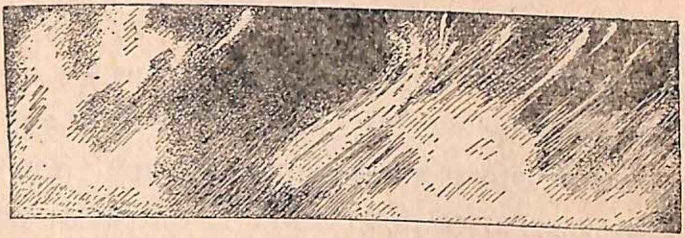
কুয়াশা—বায়ুপ্রবাহ না থাকলে শীতের রাতে অনেক সময় ভূ-সংলগ্ন বাতাসের উষ্ণতা উপরের বাতাসের চেয়ে এত কমে যায় যে,

ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি সমস্ত বায়ুই জলীয় বাষ্পে সংতৃপ্ত হ'য়ে পড়ে। এ অবস্থায় বাতাসের জলীয় বাষ্প জ'মে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ধোঁয়ার মতো বাতাসে ভেসে থাকে, এরই নাম কুয়াশা। বায়ুপ্রবাহ থাকলে কিংবা আকাশ ধূলিমুক্ত হ'লে কুয়াশা-সৃষ্টিতে বিঘ্ন হয়। শহরাঞ্চলের বায়ুতে ধূলিকণা বেশি থাকে তাই সেখানে কুয়াশা বেশি হয়।

মেঘ ও বৃষ্টি—সূর্যের উত্তাপে প্রথমে মাটি এবং পরে বাতাস গরম হয়। সেজন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় বাতাসের তাপ তত কম হয়। তা ছাড়া উপরের দিকে বাতাসের চাপ ক্রমশ কমে যায় ব'লে বাতাস উপরে উঠে প্রসারিত হ'য়ে আরও ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। ভূ-সংলগ্ন গরম বাতাস সমুদ্র, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প নিয়ে আরও হালকা হ'য়ে যায় ব'লে সহজেই উপরের দিকে উঠে যায়। এই বাতাস যত উপরে ওঠে তত ঠাণ্ডা হ'তে থাকে, আর তার জলীয় বাষ্প ধারণ করবার ক্ষমতা যায় কমে। এর ফলে খানিকটা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। আরও উপরে উঠলে এসব জলকণা আকারে আরও একটু বড় হ'য়ে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘের জলকণাগুলো আকারে এত ছোট থাকে যে, সেগুলো অনায়াসে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে।

আকাশে নানা আকারের মেঘ দেখা যায়। সব মেঘেই কিন্তু বৃষ্টি হয় না। মেঘ চার রকম—

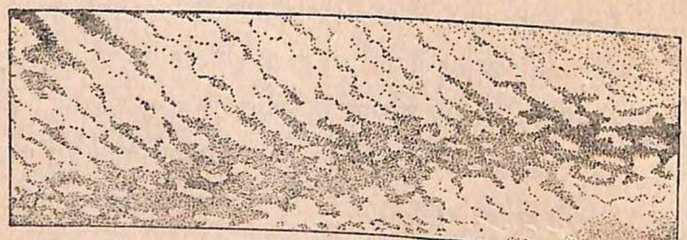
(১) কাপাসে মেঘ—এই মেঘ সাদা কাপাস তুলোর মতো আকাশের খুব উঁচু স্তরে দেখা যায়। আকাশের প্রায় পাঁচ-ছ মাইল উপরে এই মেঘ থাকে এবং সাধারণত আবহাওয়া বদলাবার আগে একে দেখা যায়।



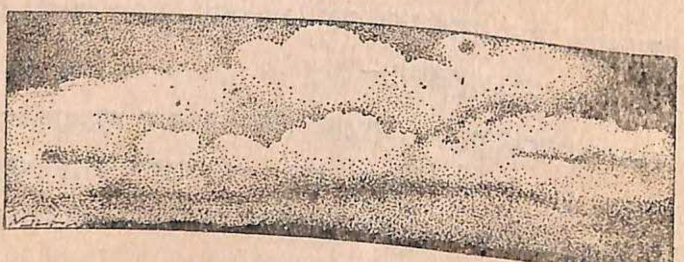
কাপাসে মেঘ



স্তূপ মেঘ



স্তর মেঘ



জলদ মেঘ বা বাদল মেঘ

(২) স্তূপ মেঘ—গ্রীষ্মকালের আকাশে মাঝে মাঝে পাহাড়ের মতো যে মেঘের স্তূপ দেখা যায়, তারই নাম স্তূপ মেঘ। ভোরবেলা এই মেঘের সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিকেলের দিকে তা আবার মিলিয়ে যায়। এই মেঘের উপর সূর্যের আলো পড়লে নানা রঙের খেলা দেখা যায়। সাধারণত পাঁচ-ছ হাজার ফুট উঁচুতে এই মেঘ থাকে।

(৩) স্তর মেঘ—শরৎকালের রাত্রে আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে যে রূপালী মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো থাকে, তারই নাম স্তর মেঘ। এই মেঘ প্রায় দু-হাজার ফুট উঁচুতে জমে এবং সাধারণত সূর্যোদয়ের একটু পরেই মিলিয়ে যায়।

(৪) জলদ মেঘ বা বাদল মেঘ—বর্ষাকালে ধূসর বা কালো পাহাড়ের মতো যে মেঘ বিচ্ছিন্ন এবং এলোমেলোভাবে আকাশ ছেয়ে ফেলে এবং যে মেঘ থেকে প্রায়ই বৃষ্টি হয়, তারই নাম জলদ মেঘ বা বাদল মেঘ। জলভরা এই মেঘ ভারি ব'লে একে আকাশে প্রায় এক হাজার ফুট উঁচুতেই দেখা যায়। প্রবল বাতাস থাকলে এই মেঘ দ্রুতবেগে গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। এই সময় প্রায়ই ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। তখন আকাশের অবস্থা দেখলেই আশঙ্কা হয় পৃথিবীটা বুঝি বৃষ্টির জলে ভেসে যাবে।

বিভিন্ন ঋতুতে তোমরা মেঘগুলি ভালো ক'রে লক্ষ্য করবে এবং খাতায় এসব মেঘের ছবি আঁকবে। এইসঙ্গে মেঘের নাম এবং তার বিবরণও সংক্ষেপে লিখে রাখবে।

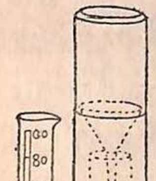
এতে বোঝা গেল, ভূপৃষ্ঠের অনেক উপরের বায়ুস্তরে কুয়াশা সৃষ্টি হ'লে তাকেই সাধারণভাবে মেঘ বলা হয়। ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে মেঘের জলকণাগুলো আরও বড় ও ভারি হ'য়ে পড়লে আর বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না, বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

বৃষ্টির অবিরল জলধারায় খাল-বিল, নদ-নদী সব কূলে কূলে ভরে

ওঠে এবং শুকনো মাটি সরস ও উর্বর হয়। এর ফলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সহজে নিত্যপ্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ ক'রে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। যে দেশে বৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ মরুভূমির দেশে উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোনো জীবই বেঁচে থাকতে পারে না।

খাল-বিল, নদ-নদী প্রভৃতির জল ক্রমাগত বাষ্পীভূত হ'য়ে বায়ুর সঙ্গে মিশছে ব'লে গ্রীষ্মকালে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে জলাভাব দেখা দেয়। কিন্তু বর্ষাকালে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে মেঘের সৃষ্টি করে এবং পরে বৃষ্টির আকারে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। যুগ যুগ ধরে বায়ুমণ্ডলে এভাবে জলের আদান-প্রদান চলছে ব'লেই উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনযাত্রা এত সহজ হয়েছে।

বৃষ্টিমান যন্ত্র—কোথায় কতটা বৃষ্টিপাত হ'ল তা বৃষ্টিমান যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে মাপা যায়। তোমরা ইচ্ছা করলে নিজেরাই এই যন্ত্র তৈরি ক'রে নিতে পার। এজন্য দরকার পাঁচ থেকে আট ইঞ্চি ব্যাসের একটি ফানেল আর একটি কাচের বোতল, যার তলাকার ব্যাস ঠিক ফানেলটার সমান। বোতলের গায়ে ইঞ্চির দাগ কাটা থাকবে। আর ফানেলসহ বোতলটি একটি টিনের পাত্রে বসানো থাকবে (চিত্র ৭ দেখ), যাতে বৃষ্টির জল ফানেলে পড়ে বাইরে ছিটকে যেতে না পারে। ফানেলের মধ্যে যে বৃষ্টি পড়ে তা নীচের বোতলে গিয়ে জমা হয়, আর নীচের দাগ থেকে সহজেই বোঝা যায় কত ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে।



বৃষ্টিমান-যন্ত্র
চিত্র ৭

বৃষ্টির পরিমাণ মাপার জন্য অনেক সময় আর একটি দাগকাটা সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এর মুখের ক্ষেত্রফল ফানেলের মুখের ক্ষেত্রফলের দশভাগের একভাগ থাকে। বৃষ্টিমান যন্ত্রে যতটুকু জল

জমা হয় তা এই সিলিণ্ডারে ঢেলে নেওয়া হয়। এখন বোতলের মধ্যে জল যদি ১ ইঞ্চি উঁচুতে উঠে থাকে, তবে সেই পরিমাণ জলই সিলিণ্ডারের মধ্যে ১০ ইঞ্চি উঁচু অবধি উঠবে। এজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় আসামের খাসিয়া পাহাড়ে চেরাপুঞ্জির নিকটে অবস্থিত মৌসিনরাম নামক স্থানে।

তুষার ও শিলাবৃষ্টি—মেঘের জলকণা পৃথিবীর আকর্ষণে নীচে পড়তে চায়। কিন্তু উর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ থাকলে তা ক্রমশ উপরদিকে উঠতে থাকে। এই জলকণা যত উপরদিকে ওঠে, উর্ধ্ব-স্তরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে তার উষ্ণতা তত কমে। এভাবে উষ্ণতা ০° সেন্টিগ্রেডের চেয়েও অনেক কমে গেলে জলকণাটি ক্ষুদ্র বরফের কণায় পরিণত হয়।

জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হ'য়ে একবার তুষারে পরিণত হ'লে আশে-পাশের আরও অনেক জলকণা তার উপর দ্রুত জমতে থাকে ব'লে তার আকার খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে।

ভূ-সংলগ্ন বায়ুর উষ্ণতা বেশ কম থাকলে জলীয় বাষ্প সোজাসুজি তুষারে পরিণত হ'য়ে ভূপৃষ্ঠে পড়তে থাকে। এজন্য পাহাড়ের উপরে এবং পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশগুলোতে অনেকসময় বৃষ্টির বদলে তুষারপাত হয়। একই কারণে উঁচু পর্বতের চূড়ায় সবসময় বরফের স্তূপ জমে থাকে।

বায়ুর উর্ধ্বস্তরে এভাবে তুষারের সৃষ্টি হ'লে তা ওজনে ভারি হ'য়ে যায় ব'লে নীচের দিকে পড়তে থাকে। এ অবস্থায় তার উপর নীচের সংতৃপ্ত বায়ুস্তর থেকে আরও জলীয় বাষ্প স্ফটিকের আকারে জমা হ'লে শিলার সৃষ্টি হয়। এভাবে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় শিলার আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

বায়ুপ্রবাহ—নীচের কয়েকটি কারণে বায়ুপ্রবাহ দেখা দেয় ঃ—

(১) বাতাস গরম হ'লে প্রসারিত হ'য়ে হালকা হয়, তাই তখন সহজেই উপরের স্তরে উঠে যায়।

(২) জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা, কাজেই গরম বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাতাসের পক্ষে উপরে ওঠা সহজ হয়।

(৩) হালকা বাতাস উপরে উঠে গেলে সেখানে বায়ুর চাপ কমে যায়, তখন বায়ু-চাপের সমতা রক্ষার জন্য আশেপাশের অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলের বায়ু এই অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে।

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের উষ্ণতা এবং বায়ুতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনুযায়ী বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য সারা বছর ধরেই পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার বায়ুপ্রবাহ চলতে দেখা যায়।

সূর্যকিরণে স্থলভাগ ও জলভাগ সমান গরম হয় না ব'লে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে সর্বদাই বায়ুপ্রবাহ চলতে থাকে। স্থলভাগ যত তাড়াতাড়ি এবং যে পরিমাণে উত্তপ্ত হয়, জলভাগ তা হয় না। দিনের বেলা সূর্যকিরণে সমুদ্রতীরের স্থলভাগ সমুদ্রের জলের চেয়ে তাড়াতাড়ি

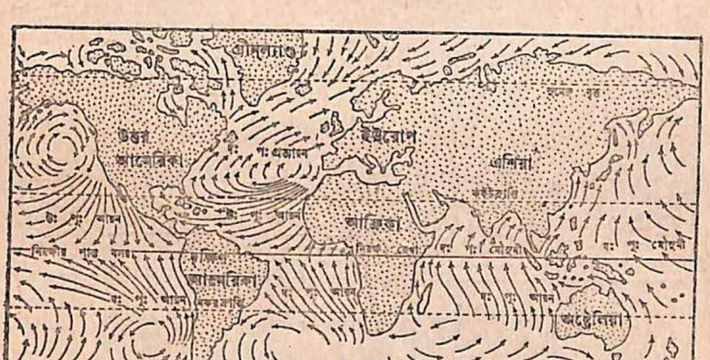


চিত্র ৮

এবং বেশি পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। উত্তপ্ত স্থলভাগের উপরস্থ বায়ু গরম ও হালকা হ'য়ে উপরে উঠে যায় ব'লে সেখানকার চাপ কমে যায়। তখন সমুদ্র-অঞ্চল থেকে ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারি বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়; এর নাম সমুদ্রবায়ু। আবার, সন্ধ্যার পর স্থলভাগ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে

যায়। অপরদিকে সারাদিন তাপ সঞ্চয় ক'রে সমুদ্রজল গরম হ'য়ে থাকে এবং এত সহজে ঠাণ্ডা হ'তে পারে না। তখন সমুদ্রের উপরের বায়ু গরম ও হালকা ব'লে উপরে উঠে যায় এবং স্থলভাগ থেকে ঠাণ্ডা ও ভারি বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়, এর নাম স্থলবায়ু।

গ্রীষ্মকালে সূর্য আমাদের মাথার উপরে থাকে। এজন্য দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ড অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, তাই এ অঞ্চলে বায়ুর চাপ খুব কমে যায়। এর দক্ষিণে সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকে, তাই তখন সমুদ্রের বায়ু প্রবলবেগে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। এর নাম গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু। আমাদের দেশে এই বায়ু-



চিত্র ৯—গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু

প্রবাহ আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে। ইহা সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে ব'লে এর মধ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। সেজন্য ইহা যখন বাংলা দেশ, আসাম এবং ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে সূর্য অনেক দক্ষিণে থাকে, তাই তখন পূর্বোক্ত স্থলভাগ শীতল, কিন্তু সমুদ্রের জল

উষ্ণ থাকে এজন্য ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের উপর বায়ুচাপ হ্রাস পায়। তাই তখন দক্ষিণ এশিয়ার স্থলভাগ থেকে ঠাণ্ডা বায়ু সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। এর নাম শীতের মৌসুমী বায়ু। আমাদের দেশে এই বায়ুপ্রবাহ উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে আসে। এই বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে ব'লে এর মধ্যে জলীয় বাষ্প থাকে না। তাই সাধারণত এই বায়ুপ্রবাহের জন্য বৃষ্টিপাত হয় না।

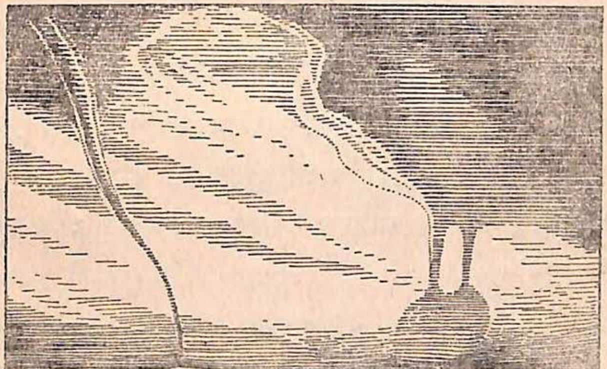


চিত্র ১০—শীতের মৌসুমী বায়ু

গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপে মাটি ও বালুচর অত্যন্ত গরম হয় ব'লে সেখানকার বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায়, তখন চারদিক্ থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এসে শূন্যস্থান পূরণ করতে চায়। এর ফলে যে প্রবল বায়ুপ্রবাহ দেখা দেয় তারই নাম ঝড়। প্রবল ঝড়ের সময় গাছপালা, ঘরবাড়ি প্রভৃতি ভেঙে পড়ে ব'লে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়। কোনো অল্পপরিসর স্থান যদি হঠাৎ খুব গরম হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে সেখানকার বায়ু তাড়াতাড়ি উষ্ণ ও হালকা হ'য়ে উপরে উঠে যায়। তখন চারদিকের অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানগুলো থেকে বায়ু ঐদিকে ছুটে

আসে। এই বাতাস ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে উপরদিকে উঠে যায়। এরূপ ঘূর্ণায়মান উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহকে ঘূর্ণবাত বলা হয়। ঘূর্ণবাত অতি ভীষণ ঝড়, এর টানে বড় বড় গাছপালা বা ঘরবাড়ি সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ১৩১৬ ও ১৩২৬ সালে বাংলাদেশে আশ্বিনের ঝড়ের ধ্বংসলীলার গল্প তোমরা হয়তো শুনেছ।

ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রস্থ বায়ু উপরে উঠে ঠাণ্ডা হ'লে, তার জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। এজন্য ঘূর্ণবাতের কেন্দ্রে ঝড় ও বৃষ্টি দুই-ই হয়। ঘূর্ণবাত সমুদ্রের উপর দিয়ে গেলে,

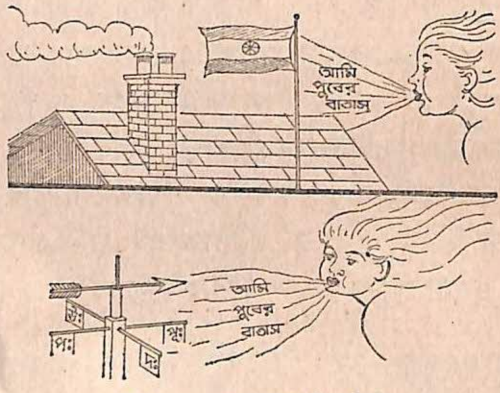


চিত্র ১১—জল-স্তম্ভ

কোনো কোনো স্থানের জলরাশি থামের আকারে উঠে যায়, এর নাম জল-স্তম্ভ। একই কারণে মরুভূমিতে বালুকা-স্তম্ভের সৃষ্টি হয়।

বায়ুপ্রবাহের দিক্-নির্ণয়—বায়ুপ্রবাহের দিক্ বলতে বোঝায়, বাতাস কোন্দিক্ থেকে আসছে। বাতাস কোন্দিক্ থেকে

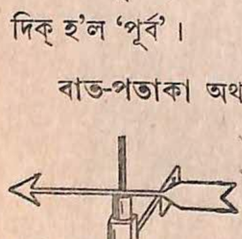
আসছে তা বুঝবে কি ক'রে? ঘরের উপরে যদি চিমনি থাকে, তাহ'লে দেখ, চিমনির ধোঁয়া কোন্‌দিকে যাচ্ছে। অথবা ঘরের



চিত্র ১২—বায়ুপ্রবাহের দিক্-নির্ণয়

উপরে যদি কোনো পতাকা থাকে, তাহ'লে দেখ, তা উড়ে কোন্‌দিকে যাচ্ছে। মনে কর, ধোঁয়া অথবা পতাকা পশ্চিমদিকে যাচ্ছে। তাহ'লে বুঝবে, বাতাস আসছে পূবদিক্ থেকে অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের দিক্ হ'ল 'পূর্ব'।

বাত-পতাকা অথবা বায়ু-নিশানের সাহায্যেও বায়ুপ্রবাহের দিক্ আরও ভালো ক'রে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চারটি প্রধান দিক্ অনুসারে চারটি বাহু থাকে এবং তাদের গায়ে উ, দ, পূ ও প এই চারটি অক্ষর লাগানো থাকে। এই বাহুগুলি স্থির থাকে, নড়ে না। এর উপরে একটি খুঁটির মাথায় একটি তীর (অথবা মোরগ) এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে বায়ুপ্রবাহে তা

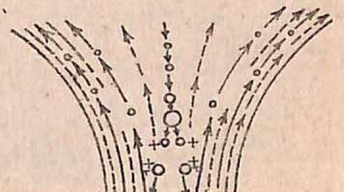


বাত পতাকা

চিত্র ১৩

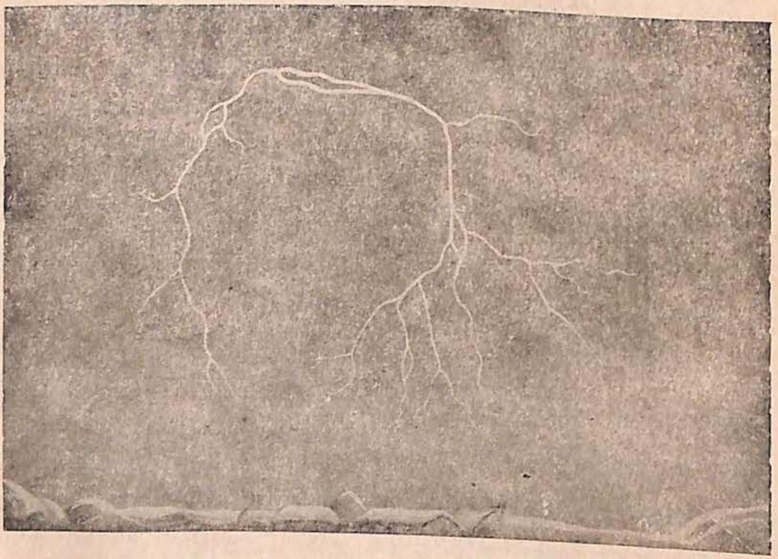
সহজেই ঘুরতে পারে। তীরের একদিকে থাকে ফলা, আর অন্যদিকে থাকে পাখনা। যেদিক থেকে বাতাস বয়, তীরের (অথবা মোরগের) মুখ সেদিকে ঘুরে থাকে। মনে কর, তীরের মুখ রয়েছে উত্তরদিকে, তাহ'লে বুঝবে যে, বাতাস বইছে উত্তরদিক্ থেকে, অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের দিক্ হ'ল 'উত্তর'। এভাবে তীরের মুখ কোন্‌দিকে আছে তাই দেখে সহজেই বায়ুপ্রবাহের দিক্ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

বজ্রপাত—আগে আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, বজ্রপাত হ'ল কোনো দেবতার প্রত্যক্ষ কাজ। কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন রেশমের সুতোর সাহায্যে ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎ নামিয়ে আনলেন। তাতে বোঝা গেল, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি প্রকৃতপক্ষে একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন প্রশ্ন, মেঘের মধ্যে এত বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের সমাবেশ হ'ল কি ক'রে?


চিত্র ১৪—জলকণার বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হওয়া

বিজ্ঞানী সিম্প্‌সনের মতে একটি বড় জলকণা যখন ঊর্ধ্বগামী বায়ু-প্রবাহের ভেতর দিয়ে পড়তে থাকে তখন তা ভেঙে আরও ছোট ছোট অনেকগুলো জলকণায় পরিণত হয়। এ সময় জলের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণে জলকণাগুলো পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়, অপরদিকে চারপাশের বায়ুকণাগুলো নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়। এভাবে জলকণাগুলো যত নীচের দিকে নামতে থাকে তত ভেঙে আকারে আরও ছোট হ'তে থাকে এবং তাতে পজিটিভ বিদ্যুতের পরিমাণও ক্রমশ

বাড়তে থাকে। এভাবে জলকণার আকার ক্রমশ এত ছোট হ'য়ে পড়ে যে তা উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে আবার উপরদিকে উঠে যায়। উপরে ঠাণ্ডা, কাজেই সেখানে একে কেন্দ্র ক'রে আরও জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়। এর ফলে জলকণাটির আকার আবার বড় হয় এবং ভারবশত তা আবার নীচের দিকে পড়তে থাকে। এভাবে



চিত্র ১৫—বজ্রপাত

জলকণাগুলো বারে বারে উপরে-নীচে ওঠানামা করতে থাকে। এর ফলে, তার পজিটিভ বিদ্যুতের পরিমাণও ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষে মেঘে বিদ্যুতের পরিমাণ এত বেশি হ'য়ে পড়ে যে, এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বিদ্যুৎক্ষরণ হয়। একেই বলা হয় 'বিদ্যুৎ-চমকানো'। আবার কখনো কখনো মেঘ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে। এরই নাম বজ্রপাত।

মনে কর, পাশাপাশি হু'টি জলের চৌবাচ্চা আছে, একটি উঁচুতে আর একটি একটু নীচুতে। আর উপরের চৌবাচ্চাটি জলে ভর্তি আছে। একটা রবারের নল দিয়ে এই চৌবাচ্চা হু'টি জুড়ে দিলে দেখবে, উপরের চৌবাচ্চা থেকে জল নীচের চৌবাচ্চায় চলে যাচ্ছে। কিন্তু তাই ব'লে জল সবটা যাবে না। খানিকক্ষণ পরে যখন হু'টো চৌবাচ্চাতেই জল সমান উঁচুতে থাকবে, তখন জলের প্রবাহ থেমে যাবে।

বজ্রগর্ভ মেঘ বায়ুপ্রবাহে ভেসে যাওয়ার সময় নীচের ভূপৃষ্ঠে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতের আবেশ সঞ্চার করে। এই হুই বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতের মধ্যে আকর্ষণ হয়। তখন আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসে পৃথিবীতে। কিন্তু এই হু'য়ের মধ্যে বায়ুস্তর থাকায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ তত সহজে হয় না, কারণ বায়ুস্তর অত্যন্ত কুপরিবাহী। তবে মেঘের বিদ্যুতের পরিমাণ খুব বেশি হ'লে বায়ুর ভেতর দিয়েই, জলস্রোতের মতো, বিদ্যুৎ বইতে আরম্ভ করে। এর ফলে বায়ুকণাগুলো অত্যধিক উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। এই তাপ হঠাৎ আলো হ'য়ে ফুটে বেরোয়, তখন আমরা দেখি যে বিদ্যুৎ চমকালো। আবার এই ভীষণ তাপের প্রভাবে অনেকটা জায়গার বায়ু হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে প্রসারিত হ'তে চেষ্টা করে, তাই হঠাৎ একটা বোমাফাটার মতো বিকট আওয়াজ হয়। একেই আমরা বাজ-পড়ার শব্দ বা 'মেঘের ডাক' বলি। বজ্রপাতের শব্দ বিভিন্ন স্তরের মেঘ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে আসে ব'লে একাধিক প্রতিধ্বনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের কানে প্রবেশ করতে থাকে, তাই আমরা মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি শুনতে পাই।

ভূপৃষ্ঠের যে বস্তুটি সবচেয়ে উঁচু তার উপরে আবিষ্ট বিদ্যুৎই মেঘের সবচেয়ে কাছে থাকে, কাজেই মেঘ থেকে একটা বিরাট স্ফুলিঙ্গ ঐ বস্তুটির ভেতর দিয়েই মাটিতে পৌঁছায়। আমরা বলি, ঐ বস্তুটির

পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঝরিয়া, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমে কাদামাটি, তারপর পলি-পাথরের অনেক স্তর খুঁড়ে তবে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। কয়লা কাটতে হয় খুব সাবধানে, নতুবা উপরের ভারি স্তর ধ্বসে গিয়ে অনেক শ্রমিক মারা যেতে পারে। এজন্য বিরাট্ বিরাট্ থামের মতো কয়লা রেখে বাকিটা কাটা চলে। মাটির নীচে কয়লা কাটা হ'লে কপিকলের সাহায্যে তা উপরে তুলে আনা হয়; তারপরে রেলগাড়ি, স্টীমার ও জাহাজের সাহায্যে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়।



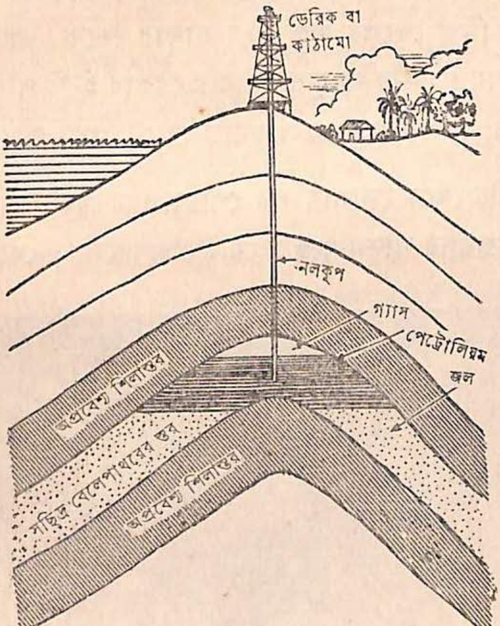
চিত্র ২০—খনির মধ্যে একজন শ্রমিক কয়লা কাটছে। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন।

কয়লা কি শুধু আগুন জ্বালাবার কাজেই দরকার? কয়লা থেকে আজকাল অনেক দরকারী জিনিস পাওয়া যায়। লোহার বদ্ধপাত্রে কয়লা নিয়ে তাতে উত্তাপ দিলে পাওয়া যায় কয়লা-গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি। ঐ লোহার পাত্রে যে কয়লা পড়ে থাকে, তার নাম কোক, তাকেই আমরা জ্বালানি কয়লারূপে ব্যবহার করি। কয়লা-গ্যাস দিয়ে বড় বড় শহরের আলো জ্বালানো হয়। কলকাতার অনেক রাস্তায় এখনও গ্যাসের আলো দেখা যায়। অ্যামোনিয়া থেকে পাওয়া যায় জমির সার অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট। শুনে হয়তো অবাক্ হবে, কয়লা থেকে পাওয়া কালো চট্‌চটে দুর্গন্ধময় আলকাতরা থেকেই তৈরি হয়

নানারকম রং, অনেকপ্রকার স্থগন্ধি এবং অনেকরকম ওষুধ। আর এ-থেকে পাওয়া যায় স্যাকারিন, যা চিনির চেয়েও প্রায় চারশ' গুণ মিষ্টি।

পেট্রোলিয়ম

মাটির নীচে পলি-পাথরের স্তরে যে খনিজ তেল পাওয়া যায়, তার নাম পেট্রোলিয়ম। বিজ্ঞানীর মতে অতীতের কতকগুলি উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই এ তেলের সৃষ্টি হয়েছে। উপরে ও নীচে



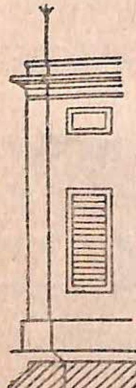
চিত্র ২১—পেট্রোলিয়মের অবস্থান

অপ্রবেশ্য পাথরের স্তর থাকলে এ তেল উৎপত্তিস্থলেই আটকা থাকে, নতুবা সচ্ছিদ্র পাথরের ভেতর দিয়ে বা শক্ত পাথরের ফাটল দিয়ে

উপরে বজ্রপাত হ'ল। এরূপ হ'লে তার ফল মানুষ বা জীবজন্তুর পক্ষে মারাত্মক হয়। এর ফলে গাছপালা বা জীবজন্তু পুড়ে মরে। আমাদের দেশে প্রতিবছরই এরূপ দুর্ঘটনা অনেক হয়।

ঘরের বাইরে থাকতে হঠাৎ বজ্র-বিদ্যুৎসহ ঝড় আরম্ভ হ'লে গাছ, দেওয়াল বা ঐরূপ কোনো উঁচু জায়গার নীচে আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ ক'রে সেটাই যদি কাছাকাছি একমাত্র উঁচু জায়গা হয়। সেসময় খাঁড়ি বা গর্তের মধ্যে থাকলে অথবা মাটিতে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

বজ্রপাত থেকে ঘরবাড়ি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য সাধারণত বজ্ররক্ষী ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি ধাতব দণ্ড এবং এর এক প্রান্তে কতগুলি তীক্ষ্ম সূচীমুখ থাকে। এই প্রান্তটি ঘরবাড়ির সর্বোচ্চ অংশের আরও উপরে রাখা হয় এবং দণ্ডের অপর প্রান্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। বজ্রগর্ভ মেঘ এর উপরে এলে, নীচের আবেশোদ্ভব বিদ্যুৎ সহজেই সূচীমুখ দিয়ে ক্ষরিত হ'য়ে যায় ব'লে আর বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে না। দৈবাৎ বজ্রপাত হ'লে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঐ দণ্ডের ভেতর দিয়েই সবচেয়ে সহজে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। তাই তখন ঘরবাড়ির বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না।



বজ্ররক্ষী
চিত্র ১৬

শ্বাসকার্য

শ্বাসকার্যের জন্য বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন—আমরা সবসময় বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি। খাদ্য বা পানীয়ের অভাবে জীবমাত্রই কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু অক্সিজেনের অভাব হ'লে

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকল জীবই দম বন্ধ হ'য়ে মারা যায়। একটা জারের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বেলে তার মুখটা বন্ধ ক'রে রাখ। কিছুক্ষণ পরে বাতিটা নিভে যাবে। অক্সিজেন মোমবাতির দহনে সহায়তা করে, কাজেই অক্সিজেন ফুরালে মোমবাতি নিভে যায়। জারটা ঠাণ্ডা হবার পর তার মধ্যে একটা জীবন্ত ফড়িং অথবা ইঁদুর রেখে তার মুখটা বন্ধ ক'রে দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখবে, দম বন্ধ হওয়ার ফলে জীবটি মরে গেছে। এতে বোঝা গেল, অক্সিজেনের অভাবে মোমবাতির দহন বা জীবের শ্বাসকার্য কোনোটাই চলতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠের ঠিক উপরের স্তরই সবচেয়ে ঘন, যত উপরে যাওয়া যায় বায়ুস্তর তত পাতলা, আর তাতে অক্সিজেনের পরিমাণও ততই কম। তা ছাড়া যত উপরদিকে ওঠা যায় উষ্ণতা তত কমতে থাকে। এজন্য এরোপ্লেনে ক'রে কিংবা বেলুনে ক'রে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বদেশে উঠবার সময় ক্রমশ বেশি শীত বোধ হ'তে থাকে, আর অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকার্য চালানো ক্রমশ কঠিন হ'য়ে পড়ে।



চিত্র ১৭—পর্বতারোহণকালে শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন-পূর্ণ সিলিণ্ডার বহন করতে হয়

উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা আরও কঠিন, কারণ সেখানে উষ্ণতা অত্যন্ত কম, সবসময় তুষার জমে থাকে, আর প্রায়ই দেখা দেয় ভয়ংকর তুষার-ঝড়। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলের উপরদিকে যত ওঠা

যায় বায়ুর চাপ তত কম হ'তে থাকে। আমাদের দেহের ভেতরে বায়ু উচ্চ-চাপে থাকে তাই তা তখন প্রসারিত হ'তে চায় ব'লে দারুন অশ্বস্তিবোধ হ'তে থাকে। এইসময় দেহের কোনো কোনো কোমল অংশে রক্তক্ষরণ হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে এই অবস্থায় থাকলে মানুষ আবার ক্রমশ আপনাকে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অর্থাৎ ক্রমশ নিম্নবায়ু-চাপের অবস্থায় অভিযোজিত হয় (adaptation)। তখন সে আবার স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসকার্য চালাতে পারে। এজন্য পর্বতারোহণকালে অক্সিজেন-পূর্ণ সিলিণ্ডার বহন করতে হয় এবং তারই সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালাতে হয়। আর নিম্নচাপের বায়ুতে থেকে অভ্যস্ত হ'য়ে ধীরে ধীরে গিরিশিখরের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তেনজিং নোরকে এবং এডমণ্ড হিলারী ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে এভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্নমালা

১। বায়ুর প্রধান উপাদান দু'টির নাম লিখ। ইহাদের আয়তনগত অংশ কিরূপ, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

২। বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। এরোপ্লেনে করিয়া অথবা পাহাড়ের উপরে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বপ্রদেশে পৌঁছাইলে কিরূপ অভিজ্ঞতা হইবে?

৩। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কিরূপে? মেঘ ও বৃষ্টি কি কি কারণে হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।

৪। শিশির ও কুয়াশা হওয়ার কারণ কি? তুষার ও শিলাবৃষ্টি হওয়ার কারণ কি বুঝাইয়া দাও।

৫। বৃষ্টিমান যন্ত্রের বর্ণনা দাও এবং উহার ব্যবহার-প্রণালী বুঝাইয়া দাও।

৬। বায়ুপ্রবাহের কারণ কি কি? বিভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৭। বায়ুপ্রবাহের দিক্ নির্ণয় করিবে কিরূপে? বাত-পতাকা কাহাকে বলে? তাহার ব্যবহার-প্রণালী বুঝাইয়া দাও।

৮। ঝড় হওয়ার কারণ কি? ঘূর্ণবাত কাহাকে বলে? জল-স্তম্ভ এবং বালুকা-স্তম্ভ দেখা দেয় কেন?

৯। বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

১০। বজ্রপাত কেন হয় তাহা বুঝাইয়া দাও। বজ্ররক্ষী কাহাকে বলে? ইহার উপকারিতা কি?

১১। একটি শব্দ অথবা বাক্যাংশদ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) শীতের রাতে বাতাসের জলীয় বাষ্প জমে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ধোঁয়ার মতো বাতাসে ভেসে থাকে, এরই নাম —।

(ii) বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বপ্রদেশে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে — সৃষ্টি করে।

(iii) অধিক শীতলতায় বায়ু থেকে ঘাস ও পাতার উপর যেসব জলবিন্দু সঞ্চিত হয়, তাদের — বলে।

(iv) বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনেকসময় — আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

(v) যত উপরদিকে ওঠা যায় বায়ুর চাপ তত — হয়।

(vi) শহরাঞ্চলে কুয়াশা বেশি হয় কারণ —।

(vii) রাত্রে কুয়াশা পড়ে কারণ —।

১২। ভুল থাকিলে সংশোধন কর (যে-কোন পাঁচটির উত্তর দাও) :—

(i) কাপাসে মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(ii) শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

(iii) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় কলিকাতায়।

(iv) গরম বাতাস ভারি ব'লে নীচের দিকে নেমে আসে।

(v) বায়ুপ্রবাহের দিক্ বলতে বোঝায় বাতাস যেদিকে যাচ্ছে।

(vi) আমরা চোখে দেখে বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি।

(vii) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দহনকার্যে সহায়তা করে।

(viii) বায়ুতে সর্বদাই অল্প পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস থাকে।

(ix) ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরদিকে ওঠা যায় বায়ু তত গরম।

(x) ঘাসের বুকে কুয়াশা জমে।

১৩। যেটি শুদ্ধ, তার পাশে (√) চিহ্ন দাও; আর যেটি অশুদ্ধ, তার পাশে (×) চিহ্ন দাও:—

(i) সবরকম মেঘেই বৃষ্টি হয়।

(ii) পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় চেরাপুঞ্জির নিকট অবস্থিত মৌসিনরাম নামক স্থানে।

(iii) গরম বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বাতাসের পক্ষে উপরে ওঠা সহজ হয়।

(iv) বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায়।

(v) গ্রীষ্মকালে ভোরবেলা ঘাস ও গাছের পাতায় প্রচুর শিশির জমা হ'য়ে থাকে।

(vi) বায়ুর নাইট্রোজেন ফুরালে প্রদীপ জ্বলতে পারে না।

১৪। নিম্নলিখিত প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে তিনটি করিয়া উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যেটি শুদ্ধ তাহার নীচে (—) দাগ দাও:—

(i) আমরা সবসময় ডুবে আছি—সমুদ্রে, মহাসমুদ্রে, বায়ুসমুদ্রে।

(ii) আমরা বায়ুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি—চোখে দেখে, স্পর্শদ্বারা, ঘ্রাণদ্বারা।

(iii) একটি গ্যাসের মধ্যে চুনের জল দিয়ে নাড়লে ঘোলা হ'য়ে যায়। সুতরাং গ্যাসটি—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড।

(iv) বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে গেলে চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসে। এর নাম—ঝড়, ঘূর্ণবাত, মৌসুমী বায়ু।

(v) সাধারণত আবহাওয়া বদলাবার আগে যে মেঘ দেখা যায়, তার নাম—স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, কাপাসে মেঘ।

(vi) বায়ু একটি—

মিশ্রণ, মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ।

১৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(i) শ্বাসকার্যের জন্য বায়ুর — প্রয়োজন।

(ii) — মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

(iii) — ও — বায়ুর দু'টি প্রধান উপাদান।

(iv) সময় সময় আকাশের মেঘ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসে পৃথিবীর মাটিতে, এরই নাম —।

(v) — মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর কথা—ভূপৃষ্ঠের নীচে

খনিজ

ভূগর্ভ নানা রত্নে ভরা। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কত মূল্যবান্ সম্পদ্ লুকানো রয়েছে। ভূগর্ভের এই সম্পদ্‌কে বলা হয় খনিজ সম্পদ্।

যা খনি থেকে পাওয়া যায়, তাকেই খনিজ বলে। কিন্তু খনিজ বলতে সবই যে খনি থেকে খুঁড়ে বের করতে হবে তা নয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বভাবজাত অজৈব বস্তুমাত্রই খনিজ ব'লে পরিচিত ; যেমন—অভ্র, সৈন্ধব লবণ, মারবেল, শ্লেট, কয়লা, পেট্রোলিয়ম ইত্যাদি। এই হিসেবে মাটি এবং জলও খনিজরূপে গণ্য হয়।

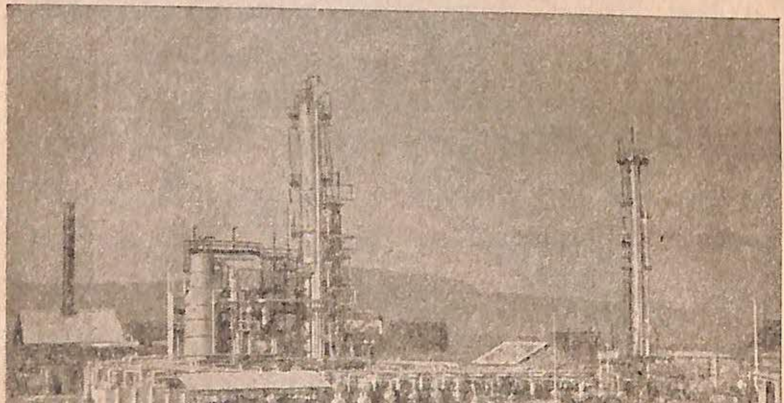
খনিজের অবস্থান

খনিজ দ্রব্য যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয়, তারই নাম খনি। খনি ভূপৃষ্ঠের উপরে অথবা ভূগর্ভে অনেক নীচে থাকতে পারে।

চুইয়ে অন্য জায়গায় সরে যায়। তেলের সঙ্গে জল থাকলে তেলটা জলের উপর ভেসে থাকে। এইসঙ্গে প্রচুর গ্যাস থাকাও সম্ভব। এ গ্যাসের অত্যধিক চাপে উপরের পাথর, মাটি সবসমেত ধনুকের মতো বেঁকে যায় আর গ্যাস, তেল ইত্যাদি প্রবল চাপের অধীন হ'য়ে থাকে। এরকম জায়গায় নলকূপ বসালে গ্যাস, তেল ইত্যাদি আপনা থেকেই সজোরে বেরিয়ে আসতে থাকে।

মাটির নীচে নল বসিয়ে এ তেল তুলে আনতে হয়। তবে কাজটা খুব সহজ নয়। পানীয় জলের নলকূপ বড়জোর তিনশ' ফুট গভীর হয়, কিন্তু তেলের জন্য তিন হাজার থেকে শুরু ক'রে ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত গভীর নলকূপ বসাবার দরকার হ'তে পারে। ভারতে আসামের ডিগবয় অঞ্চলে এবং গুজরাটে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়।

মাটির নীচ থেকে তোলার পর পেট্রোলিয়ম খুবই ময়লা থাকে। একে ছেঁকে তারপর পাতন-যন্ত্রে নিয়ে উত্তাপ দিলে এ-থেকে পর পর



চিত্র ২২—তৈল-শোধনাগার

পেট্রোল, বেন্‌জাইন, কেরোসিন, ডিজেল তেল, পিচ্ছিলকারী তেল, মোম এবং অ্যাস্‌ফাল্ট পাওয়া যায়। পেট্রোলের সাহায্যে আজকাল মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি চালানো হয়। আগে উদ্ভিজ্জ তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কেরোসিন তেল পাবার পর আমাদের আলো জ্বালাবার সমস্যা অনেকটা মিটেছে। ডিজেল তেল দিয়ে ডিজেল-ইঞ্জিন চালানো হয়। মোম দিয়ে বাতি জ্বালানো হয়, আর অ্যাস্‌ফাল্ট দিয়ে পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়।

লোহা

লোহা একপ্রকার ধাতু। ভূত্বকের ওজনের শতকরা ৪·১২ ভাগ লোহা (আয়রণ)। অ্যালুমিনিয়ম ছাড়া আর কোনো ধাতুই পৃথিবীতে এত বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় না। তবে লোহা প্রকৃতিতে মৌলিক অবস্থায় বিশেষ পাওয়া যায় না।

ভারতে প্রচুর লৌহ-খনিজ আছে এবং এদের অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর হিমাটাইট (লোহা-পাথর) বা ম্যাগ্‌নেটাইট। বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূরে প্রচুর পরিমাণে হিমাটাইট পাওয়া যায়। পশ্চিম বাঙলার বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলাতেও হিমাটাইট পাওয়া যায়। এর উপাদান প্রধানত আয়রণ (লোহা) এবং অক্সিজেন।

পশ্চিমবঙ্গের বার্নপুর এবং দুর্গাপুরের লোহার কারখানা বিখ্যাত। এ ছাড়া টাটানগর, রাউরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি স্থানেও বড় লোহার কারখানা আছে। এগুলি যেমন বিরাট্ তেমনি আশ্চর্যজনক। এখানে সবরকম কাজ এমন সুশৃঙ্খলভাবে হচ্ছে যে দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। সুযোগ পেলেই তোমরা এরূপ একটি কারখানা দেখবে। তাহ'লেই বুঝবে সভ্যতার পথে আমরা কতটা এগিয়ে গেছি।

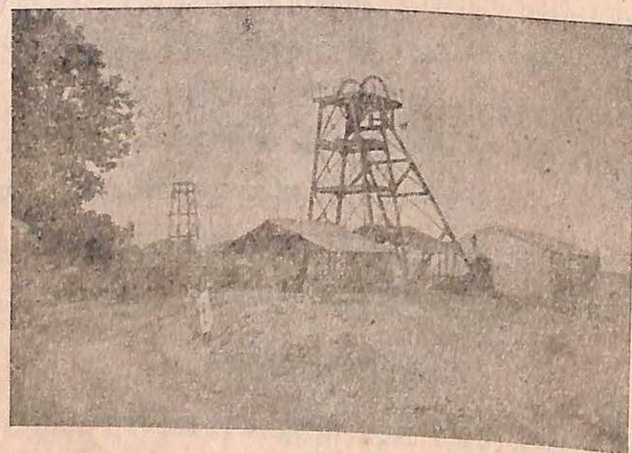
লোহা প্রধানত তিনরকম—**ঢালাই-লোহা (কাস্ট আয়রণ),**

ভূপৃষ্ঠের আলোড়নের ফলে অনেকসময় বহু নীচের খনিজ উপর-দিকে উঠে আসে, তখন সেই খনিজ সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়।

ভারতে খনিজ সম্পদে বিহারই শ্রেষ্ঠ। তারপর মাদ্রাজ, মহীশূর, ও ত্রিবাঙ্কুরের নাম করা যায়। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি প্রয়োজনীয় খনিজ আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়, আর আসামে পাওয়া যায় পেট্রোলিয়ম। লোহা-পাথর, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, মোনাজাইট প্রভৃতি আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ছাড়া আছে প্রচুর বক্সাইট, যা থেকে অ্যালুমিনিয়ম তৈরি হয়। তামা ও সোনা কিছু আছে কিন্তু রূপা, নিকেল, সীসা, দস্তা প্রভৃতির পরিমাণ খুবই কম।

কয়লা

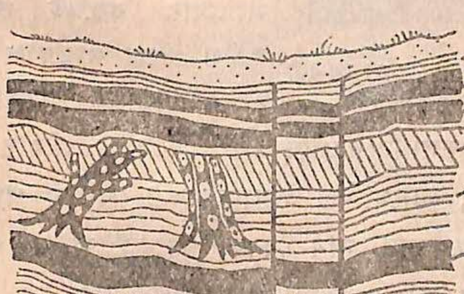
কয়লা একপ্রকার পাললিক শিলা। গাছপালা বহুকাল ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থেকে যে পলি-পাথরের সৃষ্টি করে, তাকেই



চিত্র ১৮—কয়লা-খনির দৃশ্য

কয়লা বলা হয়। কালো কুৎসিত কয়লার কত আদর তা নিশ্চয়ই জান। কয়লা ছাড়া সভ্য জগৎ একদিনও চলতে পারে না। কারণ, কয়লা ছাড়া কল-কারখানা, রেলগাড়ি, স্টীমার প্রভৃতি কিছুই চালানো সম্ভব নয়। শহরে যারা আছে, একদিন কয়লা না থাকলে তাদের রাঁধা-বাড়া বন্ধ।

মাটির নীচে কি ক'রে রাশি রাশি কয়লা তৈরি হয়েছে তা কি বলতে পার? বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যখন মানুষেরও জন্ম হয়নি তখন পৃথিবী বনে-জঙ্গলে ছেয়ে ছিল। আর তখন পৃথিবীর নানাদিকে আলোড়ন, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। তাতে হয়তো জায়গায় জায়গায় এক-একটা বিরাট্ বন গাছপালা, খাল-বিল সবসমেত মাটির নীচে তলিয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে এর ওপর বালি, পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমা হ'তে থাকে। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমে উদ্ভিদের চেহারা বদলে গিয়ে শেষ অবধি কয়লায় পরিণত হয়েছে।



কয়লার অবস্থান

চিত্র ১৯

সেজন্য বেলে-পাথর ও কাদা-পাথরের মাঝে স্তরে স্তরে কয়লা সাজানো থাকে। সময় সময় কয়লার মধ্যে উদ্ভিদের জীবাশ্মও পাওয়া যায়।

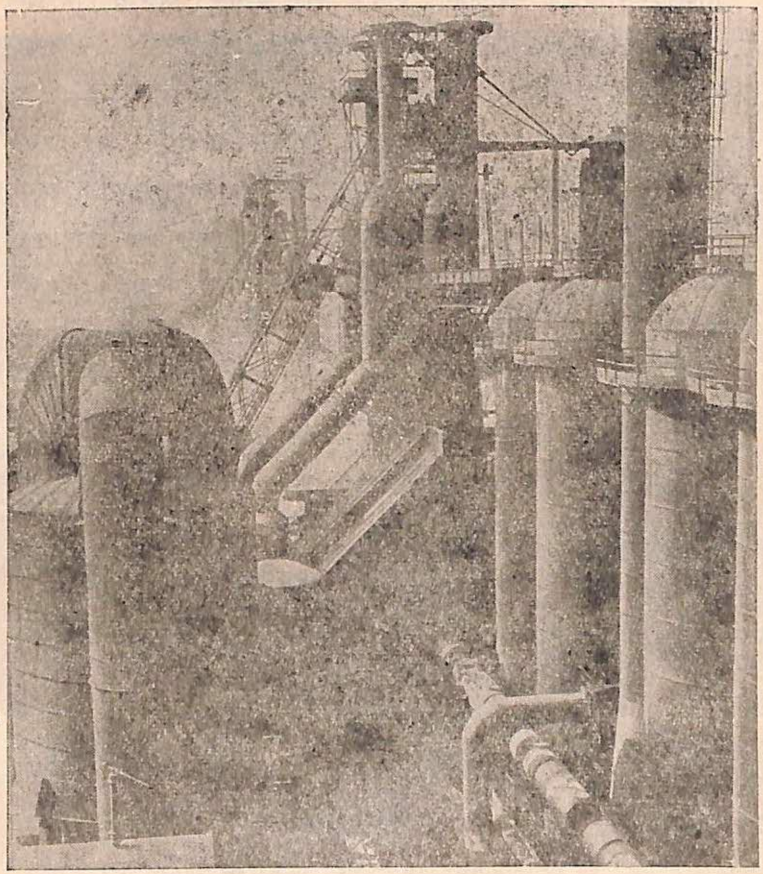
পেটা-লোহা (রট আয়রণ) এবং ইস্পাত (স্টীল)। এদের মধ্যে পেটা-লোহাই সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ।



চিত্র ২৩—লৌহ-খনিজ সংগ্রহ করা হচ্ছে

হিমাটাইট বা লোহা-পাথর কোক (কয়লা) এবং সামান্য পরিমাণ চুনাপাথরের সঙ্গে মিশিয়ে তারপর মারুত-চুল্লীতে উত্তপ্ত করলে এবং

তার ভেতর দিয়ে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ পাঠালে ঢালাই-লোহা তরল অবস্থায় পাওয়া যায়। চুন খনিজের আবর্জনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যে ধাতুমলের সৃষ্টি করে, তা তরল অবস্থায় তরল লোহার উপর ভেসে

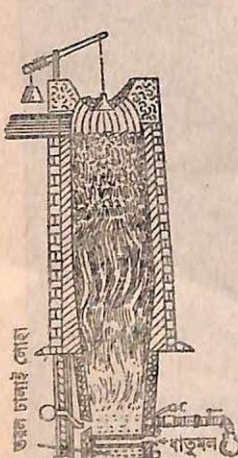


চিত্র ২৪—মারুত-চুল্লী—এর মধ্যে লোহা-পাথর থেকে ঢালাই-লোহা তৈরি করা হয়

থাকে। পৃথক্ দু'টো ছিদ্রপথে এদের চুল্লী থেকে বের ক'রে নেওয়া হয়। অন্যান্য লোহার তুলনায় এ কম তাপে গলে

(গলনাঙ্ক ১২০০° সেন্টিগ্রেড)। সেজন্য একে ঢালাই ক'রে রেলিং, থাম, কড়াই প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এ কঠিন ও ভারসহ কিন্তু ভঙ্গুর। ঘাতসহ নয় ব'লে একে পিটিয়ে জোড় দেওয়া সম্ভব হয় না।

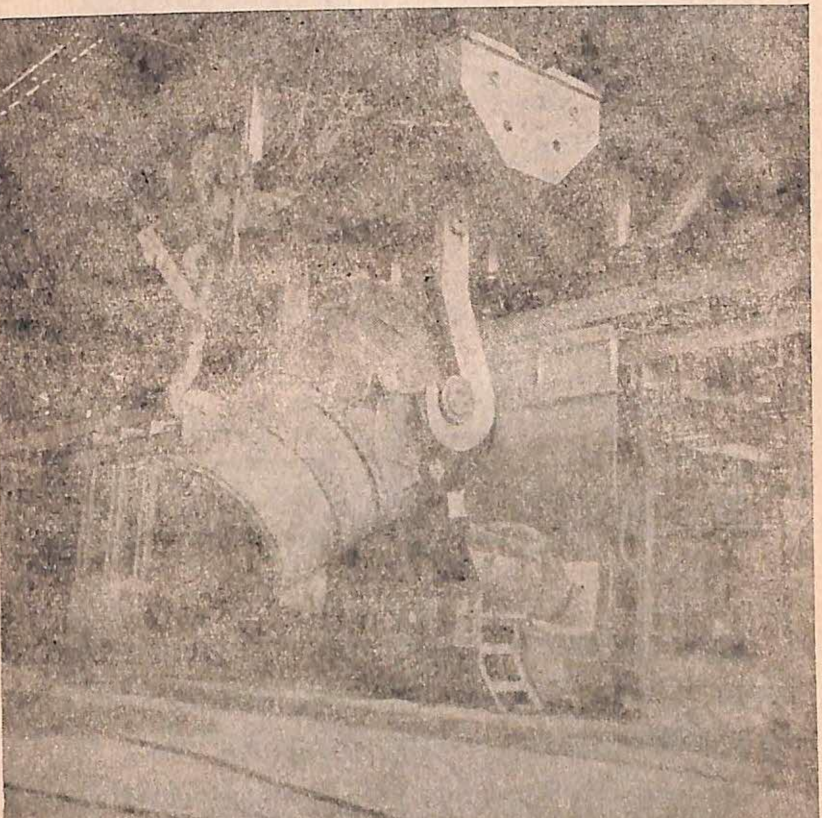
ঢালাই-লোহাতে শতকরা ২·২।৪·৫ ভাগ কার্বন (অঙ্গার) মিশ্রিত থাকে। ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ০·১৫ থেকে ১·৫ ভাগ পর্যন্ত। এর গলনাঙ্ক ১৩০০-১৪০০° সেন্টিগ্রেড। ঢালাই-লোহা থেকে কার্বনের পরিমাণ কমিয়ে ইস্পাত তৈরি করা হয়। ইস্পাতের একটা বিশেষ গুণ এই যে, একে উত্তাপ দিয়ে লাল ক'রে তারপর হঠাৎ জলে ডোবালে এ অত্যন্ত শক্ত ও ভঙ্গুর হয়, এর নাম 'ইস্পাতের পান-দেওয়া'। ছুরি, কাঁচি, তলোয়ার, উকো, স্প্রিং প্রভৃতি ইস্পাত দিয়ে বানিয়ে তারপর এভাবে পান দেওয়া হয়। তখন এগুলো অত্যন্ত কড়া ও স্থিতিস্থাপক হয়। ইস্পাত দিয়ে তৈরি অস্ত্রের ধার সহজে নষ্ট হয় না। অন্য কোনো লোহা এরূপ প্রক্রিয়ায় কড়া হয় না। ইস্পাতকে স্থায়ী চুম্বকে পরিণত করা যায়।



চিত্র ২৫—লোহা-নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত মারুত-চুল্লী

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ঢালাই-লোহা শোধন ক'রে পেটা-লোহা তৈরি করা হয়। পেটা-লোহাতে শতকরা ০·১২ থেকে ০·২৫ ভাগ কার্বন থাকে ; এর গলনাঙ্ক ১৫০০° সেন্টিগ্রেড। এ লোহা গলানো কঠিন, তবে উত্তাপ দিয়ে লাল ক'রে তারপর পেটালে এরূপ দু'খণ্ড লোহা একসঙ্গে জুড়ে যায়। এ লোহা নরম ও নমনীয়, বাঁকালে সহজে ভাঙে না। সেজন্য এ কামারের কাজের উপযোগী। এ-দিয়ে রেল, কড়ি, বরগা,

শিক, চাদর, রাং (টিন) অথবা দস্তার (জিঙ্ক) প্রলেপ দেওয়া চাদর ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ লোহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না, সেজন্য একে তড়িচ্চুম্বকে ব্যবহার করা হয়।

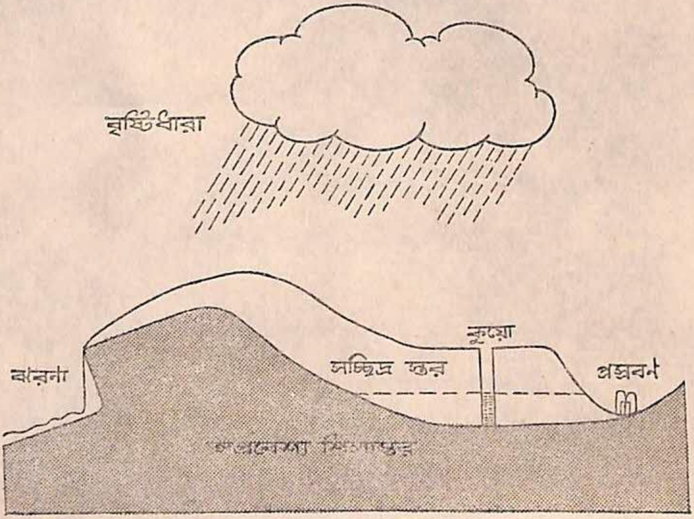


চিত্র ২৬—ইস্পাত তৈরি করার উদ্দেশ্যে চুল্লীর মধ্যে তরল লোহা ঢালা হচ্ছে

আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে সবরকম লোহাতেই কমবেশি মরিচা পড়ে।

জল

জলের উৎস—জলের উৎস দু'রকম—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগই জল। বিশাল মহাসাগর, অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, প্রস্রবণ প্রভৃতি জলের প্রধান উৎস।

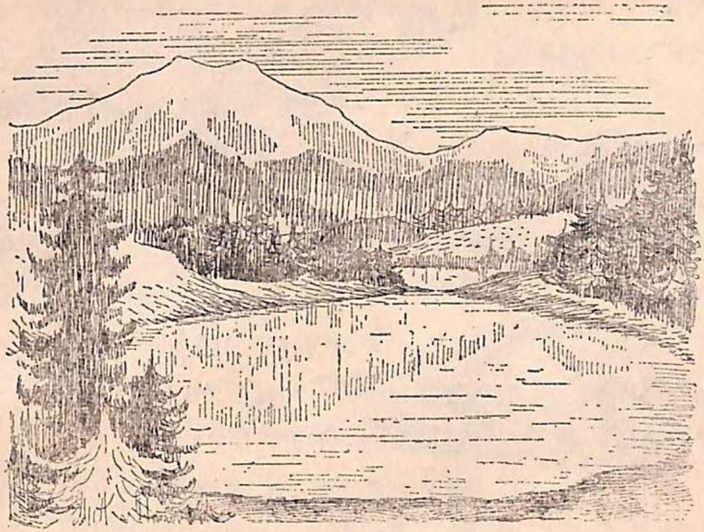


চিত্র ২৭

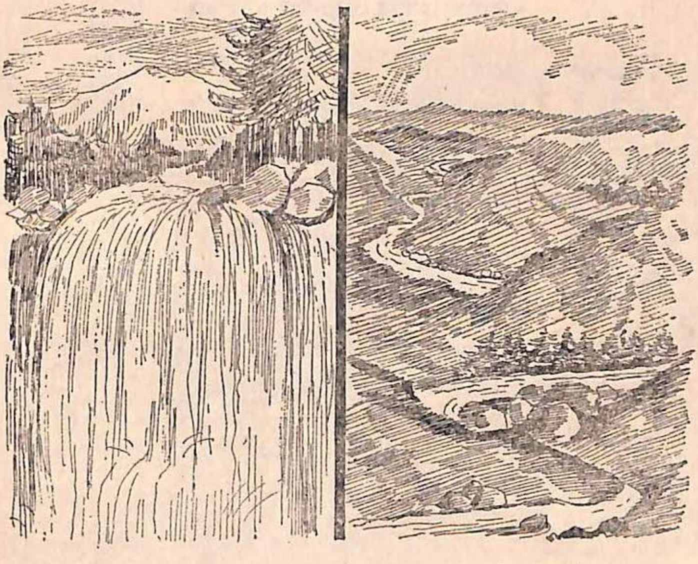
বৃষ্টির জল পাহাড়-পর্বত অথবা ভূপৃষ্ঠের উঁচু জায়গা থেকে নীচের সমতল ভূমির দিকে গড়িয়ে যায়, এতে ঝরনা, জলপ্রপাত ও নদীর সৃষ্টি হয়। নদীর জলে ভাসমান দ্রবীভূত পদার্থ খুব বেশি থাকে।

যুগযুগান্তর ধরে সমস্ত নদ-নদী, ভূপৃষ্ঠের নানারকম পদার্থ দ্রবীভূত ক'রে অথবা ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে এনে ঢালছে। তাই সমুদ্রের জলে লবণজাতীয় দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। অত্যধিক লবণাক্ত ব'লে এই জল পানের অযোগ্য।

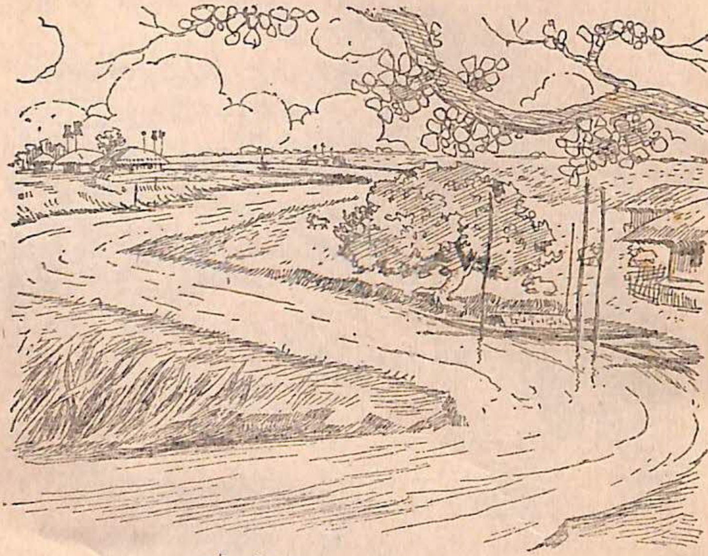
কতগুলো শিলা আছে, যাদের ভেতর দিয়ে জল চুইয়ে যেতে



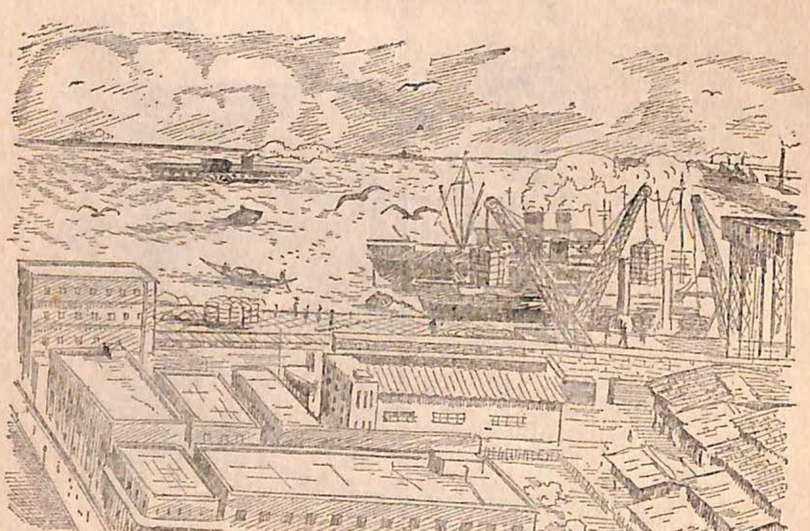
হ্রদ



ক। বৃষ্টির জল পাহাড়ের ধার দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, এভাবে ঝরনার সৃষ্টি হয়।
খ। পাহাড়িয়া নদী উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে।



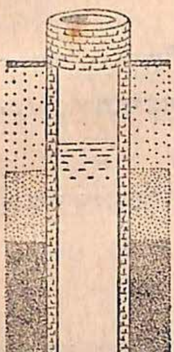
ছোট নদী গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে

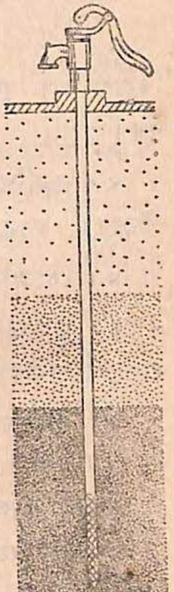


বড় নদী সমুদ্রে এসে পড়েছে

পারে, এদের সচ্ছিদ্র বা প্রবেশ্য শিলা বলা হয়। আবার কতগুলো শিলা আছে, যাদের ভেতর দিয়ে জল চুইয়ে যেতে পারে না, এদের অপ্রবেশ্য শিলা বলা হয়।

নদ-নদী অথবা বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ ক'রে সচ্ছিদ্র বালুকাময় স্তরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে থাকে। নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকলে, জল উপরের সচ্ছিদ্র স্তরে সঞ্চিত হয় অথবা অপ্রবেশ্য স্তরের উপর দিয়ে গড়িয়ে ক্রমশ আরও নীচের দিকে যেতে থাকে। জল সর্বদা এক-সমতলে আসবার চেষ্টা করে। এজন্য শিলাস্তরে কোনো ফাটল বা ছিদ্র থাকলে সেখান দিয়ে এ জল ঝরনা বা প্রস্রবণের আকারে বেরিয়ে আসে। মাটির নীচে সচ্ছিদ্র স্তরে এভাবে জল সঞ্চিত থাকে ব'লে কুয়ো খুঁড়ে অথবা নলকূপ বসিয়েও জল আহরণ করা যায়।


কুয়ো
চিত্র ২৮


নলকূপ
চিত্র ২৯

এরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত জলকে প্রস্রবণ জলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এভাবে কুয়ো এবং নলকূপের সাহায্যে জল আহরণ করার ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। এখান থেকে জল তুলে নিলে আশেপাশের স্তর থেকে জল চুইয়ে এসে সেই ভাণ্ডার আবার পূরণ ক'রে রাখে। কাজেই কুয়ো বা নলকূপে সাধারণত জলাভাব হয় না।

কূপ ও নলকূপ—বালুকাময় স্তর দিয়ে পরিস্রুত হ'য়ে আসে ব'লে কুয়োর জলে ভাসমান ময়লা থাকে না বললেই চলে। কিন্তু

এতে অনেকরকম রোগজীবাণু থাকতে পারে, কাজেই পানীয়রূপে ব্যবহার করতে হ'লে এ জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত ক'রে নেওয়া উচিত। নলকূপের নীচে ভালো ছাঁকনি থাকে, আর নলের উপরটা সব-সময় ঢাকা থাকে, সেজন্য নলকূপের জলে ভাসমান ময়লা কিংবা জীবাণু থাকে না। কাজেই এ জল না ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা চলে।

প্রশ্নমালা

১। খনিজ কাহাকে বলে? খনিজ হইতে লোহা নিষ্কাশিত করা হয় কিরূপে তাহা বুঝাইয়া দাও। লোহার ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রকৃতিতে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে কিরূপে? কয়লা উত্তোলন করা হয় কিরূপে? কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

৪। ভূগর্ভে জলের অবস্থান সম্পর্কে যাহা জান লিখ। কূপ অথবা নলকূপের সাহায্যে পানীয় জল আহরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বভাবজাত অজৈব বস্তুমাত্রই — ব'লে পরিচিত।

(ii) কয়লা একপ্রকার — —।

(iii) বিজ্ঞানীর মতে অতীতের কতকগুলি উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই — সৃষ্টি হয়েছে।

(iv) লোহা-পাথরের উপাদান প্রধানত — এবং —।

(v) ভূগর্ভের সচ্ছিদ্র স্তরে সর্বদাই — সঞ্চিত থাকে তাই — বসিয়ে তা আহরণ করা যায়।

৬। ভুল থাকিলে সংশোধন কর :—

(i) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জল খনিজরূপে গণ্য হয় না।

(ii) কয়লা একপ্রকার ধাতু।

(iii) লোহা একপ্রকার পাললিক শিলা।

(iv) পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় একরকম উদ্ভিদের বীজ থেকে।

(v) পেট্রোলিয়ম থেকে স্যাকারিন প্রস্তুত করা হয়।

(vi) ঢালাই-লোহাই সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ।

(vii) মোম পাওয়া যায় কয়লা থেকে।

(viii) অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় পেট্রোলিয়ম থেকে।

৭। নিম্নলিখিত প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে তিনটি করিয়া উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যেটি শুদ্ধ, তাহার নীচে (—) দাগ দাও।

(i) কয়লা ধাতব পদার্থ ; রূপান্তরিত শিলা ; পাললিক শিলা।

(ii) পেট্রোলিয়ম উদ্ভিজ্জ তেল ; খনিজ তেল ; প্রাণিজ তেল।

(iii) জল সচেতন পদার্থ ; মৌলিক পদার্থ ; খনিজ পদার্থ।

(iv) ভূগর্ভে নলকূপ খুঁড়িয়া আহরণ করা হয়

কয়লা ; পেট্রোলিয়ম ; লোহা।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) পশ্চিম বাঙলার — অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়।

(ii) পশ্চিম বাঙলার — লোহার কারখানা আছে।

(iii) ভারতে — — অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়।

(iv) — — না ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা চলে।

এতে অনেকরকম রোগজীবাণু থাকতে পারে, কাজেই পানীয়রূপে ব্যবহার করতে হ'লে এ জল ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত ক'রে নেওয়া উচিত। নলকূপের নীচে ভালো ছাঁকনি থাকে, আর নলের উপরটা সব-সময় ঢাকা থাকে, সেজন্য নলকূপের জলে ভাসমান ময়লা কিংবা জীবাণু থাকে না। কাজেই এ জল না ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা চলে।

প্রশ্নমালা

১। খনিজ কাহাকে বলে? খনিজ হইতে লোহা নিষ্কাশিত করা হয় কিরূপে তাহা বুঝাইয়া দাও। লোহার ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। প্রকৃতিতে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে কিরূপে? কয়লা উত্তোলন করা হয় কিরূপে? কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

৩। পেট্রোলিয়ম সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখ।

৪। ভূগর্ভে জলের অবস্থান সম্পর্কে যাহা জান লিখ। কূপ অথবা নলকূপের সাহায্যে পানীয় জল আহরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে স্বভাবজাত অজৈব বস্তুমাত্রই — ব'লে পরিচিত।

(ii) কয়লা একপ্রকার — —।

(iii) বিজ্ঞানীর মতে অতীতের কতকগুলি উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর দেহাবশেষ থেকেই — সৃষ্টি হয়েছে।

(iv) লোহা-পাথরের উপাদান প্রধানত — এবং —।

(v) ভূগর্ভের সচ্ছিদ্র স্তরে সর্বদাই — সঞ্চিত থাকে তাই — বসিয়ে তা আহরণ করা যায়।

৬। ভুল থাকিলে সংশোধন কর :—

(i) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জল খনিজরূপে গণ্য হয় না।

(ii) কয়লা একপ্রকার ধাতু।

(iii) লোহা একপ্রকার পাললিক শিলা।

(iv) পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় একরকম উদ্ভিদের বীজ থেকে।

(v) পেট্রোলিয়ম থেকে স্যাকারিন প্রস্তুত করা হয়।

(vi) ঢালাই-লোহাই সবচেয়ে বেশি শুদ্ধ।

(vii) মোম পাওয়া যায় কয়লা থেকে।

(viii) অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় পেট্রোলিয়ম থেকে।

৭। নিম্নলিখিত প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে তিনটি করিয়া উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যেটি শুদ্ধ, তাহার নীচে (—) দাগ দাও।

(i) কয়লা ধাতব পদার্থ ; রূপান্তরিত শিলা ; পাললিক শিলা।

(ii) পেট্রোলিয়ম উদ্ভিজ্জ তেল ; খনিজ তেল ; প্রাণিজ তেল।

(iii) জল সচেতন পদার্থ ; মৌলিক পদার্থ ; খনিজ পদার্থ।

(iv) ভূগর্ভে নলকূপ খুঁড়িয়া আহরণ করা হয়
কয়লা ; পেট্রোলিয়ম ; লোহা।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) পশ্চিম বাঙলার — অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়।

(ii) পশ্চিম বাঙলার — লোহার কারখানা আছে।

(iii) ভারতে — — অঞ্চলে পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায়।

(iv) — — না ফুটিয়েও নিশ্চিন্তে পান করা চলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর কথা—অভিকর্ষ

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা জান, পাকা ফল বোঁটা থেকে খসলেই মাটিতে পড়ে, উপরদিকে উঠে যায় না। আবার তোমরা যখন ছাদ থেকে কিংবা গাছ থেকে পা ফসকে পড়ে যাও, তখন নীচে মাটিতে এসে টিপ্ ক'রে পড়ো।

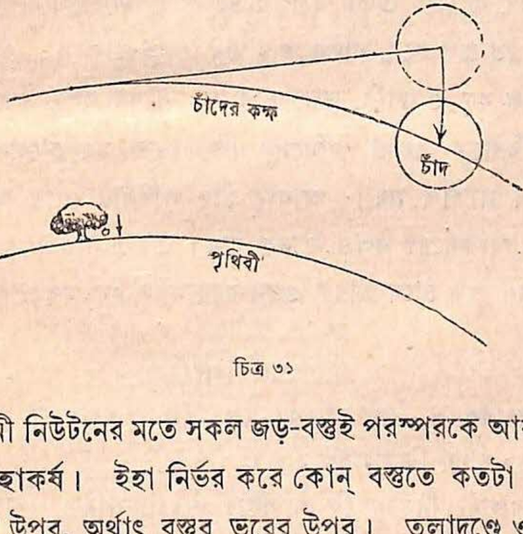
তোমরা দেখেছো, খেলার মাঠে বলে জোরে লাথি মারলে তা উপরদিকে উঠে যায়, কিন্তু আবার মাটিতে ফিরে আসে। একটা ঢিল ছুঁড়লে তাও কিছুদূর উঠে আবার নীচে নেমে আসে। একটা হাউই বাজীতে আগুন ধরিয়ে দিলে তা সজোরে আকাশের দিকে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, কিন্তু তাও আবার নীচের দিকে ফিরে আসে। কেন এমন হয়?



চিত্র ৩০—নিউটন

সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। বিজ্ঞানী নিউটন বাগানে গাছতলায় বসে আছেন, হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। তাঁর মনে প্রশ্ন হ'ল, তাই তো, আপেলটা মাটিতে পড়লো কেন? ফল পাকলে তো চিরকালই মাটিতে পড়ে, এ নিয়ে আবার কে কত ভাবে! বিজ্ঞানী নিউটনের মনে এ প্রশ্ন জেগেছিলো ব'লেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবী সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই পৃথিবীর আকর্ষণে আপেলটি মাটিতে পড়ে। এভাবে চিন্তা

করতে করতে নিউটন আরও বুঝলেন যে, এই পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়েই চাঁদ তার চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর আকর্ষণে গাছ থেকে আপেল পড়া এবং পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘোরা, এ দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করা খুবই কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, সূর্যের বিপুল আকর্ষণ আছে ব'লেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো তার চারদিকে ঘুরছে। এভাবে একটা সামান্য ঘটনার মীমাংসা করতে গিয়ে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হ'ল।



চিত্র ৩১

বিজ্ঞানী নিউটনের মতে সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এর নাম **মহাকর্ষ**। ইহা নির্ভর করে কোন্ বস্তুতে কতটা জড়-পদার্থ আছে তার উপর, অর্থাৎ বস্তুর ভরের উপর। তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে যা জানা যায়, তাকেই বস্তুর **ভর** বলা হয়। বস্তুর ভর যত বেশি হয়, মহাকর্ষের বলও তত বেশি হয়।

আবার, কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাকে **অভিকর্ষ** বলা হয়। অভিকর্ষ-জনিত বল প্রত্যেকটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

আর-একটা মজার কথা শোন। মনে কর, পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ ক'রে এফোঁড়-ওফোঁড় একটি গর্ত করা হ'ল। এখন গর্তের মুখে একটি ভারি লোহার বল ছেড়ে দিলে কি হবে? বলটি শেষপর্যন্ত পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে স্থির হবে।

একটি বস্তুকে পৃথিবী যে বলে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, তাই হ'ল ঐ বস্তুটির ভার বা ওজন। যদিও সাধারণভাবে ভর বুঝাতেই ওজন কথাটির ব্যবহার প্রচলিত আছে, তবুও একথা মনে রাখবে যে, বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভার এবং ওজন সমার্থবোধক। বিভিন্ন গ্রহের ভর বিভিন্ন রূপ, কাজেই একই বস্তু বিভিন্ন গ্রহে নিয়ে গেলে তার ভার বা ওজন বিভিন্ন রূপ হবে, যদিও তার ভর একই থাকবে। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য অনেক বড় ও ভারি, তাই তার আকর্ষণের বলও অনেক বেশি। এজন্য পৃথিবীতে একটি জিনিসের ওজন এক মণ হ'লে সূর্যে তারই ওজন হবে সাতাশ মণ। আবার চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট, তাই তার আকর্ষণের বলও অনেক কম। এজন্য পৃথিবীতে যে জিনিসের ওজন ছ'মণ হবে চাঁদে তারই ওজন হবে মাত্র এক মণ।

প্রশ্নমালা

১। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ কাহাকে বলে? মহাকর্ষের নিয়মের সঙ্গে সৌরজগতের সম্পর্ক কি বুঝাইয়া দাও।

২। বিজ্ঞানী নিউটন কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন? সৌরজগৎ সম্পর্কে তাঁহার মতামত কি?

৩। পড়ন্ত বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করিলে কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।

৪। পার্শ্বে কেবল 'হাঁ' কিংবা 'না' লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর দাও:—

(i) উপরদিকে ছুঁড়ে দিলে সব জিনিসই আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে

আসে, এর কারণ অভিকর্ষ-জনিত বল প্রতিটি বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

(ii) বিজ্ঞানী গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন যে, সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

(iii) তুলাদণ্ডে ওজন ক'রে যা জানা যায়, তাই হ'ল ঐ বস্তুটির ভার বা ওজন।

(iv) একটি জিনিসের ওজন পৃথিবীতে যা হবে, চাঁদে তার চেয়ে বেশি হবে।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে — এবং ওজন সমার্থবোধক।

(ii) কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ তাকে — বলা হয়।

(iii) বিজ্ঞানী — মতে সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এর নাম —।

(iv) চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে অনেক —, তাই তার আকর্ষণের বলও অনেক —।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃথিবী ছাড়িয়ে—আকাশের কথা

সূর্য

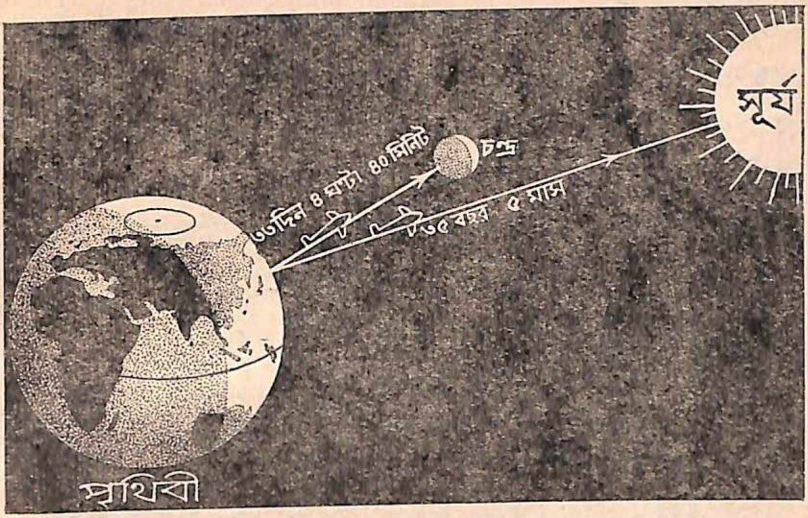
ভোরে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে দেখবে পুবের দিক্‌টা ক্রমশ লাল হ'য়ে উঠছে। একটু পরেই দেখা যাবে, সূর্য প্রকাণ্ড একটা লাল রঙের থালার মতো দেখা দিয়েছে এবং চারদিক্ আলোয় ছেয়ে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু সূর্যের আলো এত উজ্জ্বল

হ'য়ে উঠবে যে, সেদিকে সোজাসুজি তাকালে চোখ ঝল্‌সে যাবে। তখন সূর্যের তাপও বেশ অনুভব করা যাবে। এভাবে দেখা যায়, সূর্য সারা দিন আকাশটা পরিভ্রমণ ক'রে বিকেল বেলায় পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ে এবং আরও কিছুক্ষণ পরে ডুবে যায়। সন্ধ্যার গোধূলি আলো ক্রমশ ম্লান হ'য়ে যায় এবং শেষে আবার রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। প্রতিদিনই এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

সূর্যই আলোর প্রধান উৎস এবং সূর্যকেই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব'লে মনে হয়। সূর্যকে একটা থালার মতো দেখালেও তা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর চেয়েও বহুগুণ বড়। পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল (প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার) দূরে রয়েছে, তাই তাকে এত ছোট দেখায় এবং তার তাপ আমরা সহ্য করতে পারি। খুব কাছে থাকলে এ পৃথিবীটা জ্বলে-পুড়ে ছারখার হ'য়ে যেত। আবার সূর্যের তাপ এবং আলো না পেলে পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যেত এবং সর্বদা অন্ধকারে ঢাকা থাকত। তখন তাতে উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোনো জীবই বেঁচে থাকতে পারত না।

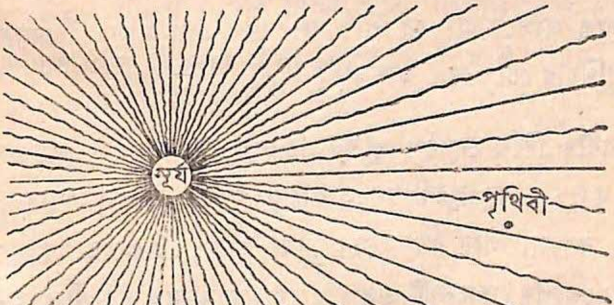
সূর্যের এই অপরিসীম দূরত্ব কি আন্দাজ করতে পেরেছ? এরোপ্লেন খুবই দ্রুতগামী, ঘণ্টায় তিনশ' মাইল (৪৮০ কিলোমিটার) বেগে চলতে পারে। কাজেই এরোপ্লেনে চেপে দশ ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল (৪,৮০০ কি. মি.) যাওয়া সম্ভব। যদি একটা এরোপ্লেনে চেপে কোথাও না থেমে ক্রমাগত সূর্যের দিকে যেতে পারতে, তাহ'লে সূর্যে পৌঁছাতে কতদিন সময় লাগত বলতে পার? লাগত প্রায় ৩৫ বছর ৫ মাস।

গ্রীষ্মকালের দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছট্‌ফট কর, একবার রোদে দাঁড়িয়ে আন্দাজ কর কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে এতদূরে



চিত্র ৩২—একটি এরোপ্লেনে ক'রে সূর্যে বা চন্দ্রে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে

থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাচ্ছ, তখন সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ংকর একবার ভেবে দেখ। জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তাপ চারদিকে



পৃথিবী সূর্যকিরণের কতটুকু পায়

চিত্র ৩৩

ছড়িয়ে পড়ছে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২৩ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ংকর

তার হিসেব বিজ্ঞানী করেছেন—সমস্ত পৃথিবীর উপর একসঙ্গে যে তাপ এসে পৌঁছায় তা যদি এক জায়গায় জমা হ'ত, তাহ'লে দশ লক্ষ মণ জল এক মিনিটের মধ্যেই টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠত। পূর্ণিমার রাতে চাঁদ থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সূর্যের আলো তার প্রায় ছ' লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

তোমরা জান, পৃথিবী সব জিনিসকে আকর্ষণ করে। সূর্যও তেমনি সব জিনিসকে আকর্ষণ করে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূর্য প্রায় ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ ভারি ব'লে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক বেশি। কাজেই পৃথিবীর এক মণ ওজনের জিনিস সূর্যে ২৭ মণ ভারি বোধ হবে। আবার সূর্যের আয়তন পৃথিবীর প্রায় তের লক্ষ গুণ। যেখানে পৃথিবীর পরিধি প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল, সেখানে সূর্যের পরিধি প্রায় সাতাশ লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার মাইল। মনে কর, একটা রেলগাড়িতে চেপে সমগ্র পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসতে লাগলো প্রায় সাড়ে চৌত্রিশ দিন, তাহ'লে সেভাবে সূর্যের উপর দিয়ে ঘুরে আসতে লাগবে প্রায় দশ বছর চার মাস। এবার ভেবে দেখ, পৃথিবীর চেয়ে সূর্য কত বড়!

দূরবীণ দিয়ে দেখলে দূরের জিনিস কাছে এবং বড় দেখায়। রঙিন কাচে ঢাকা দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের উজ্জ্বল গায়ে অনেক কালো কালো গহ্বরের মতো দেখা যায়; ওগুলো 'সৌরকলঙ্ক'। এ গহ্বরগুলোর কোনোটি এত বড় যে, আমাদের পৃথিবীও অনায়াসে তার মধ্যে তলিয়ে যাবে। এসব গহ্বরের চারপাশ থেকে যেন ভয়ংকর আগুনের শিখা হাজার হাজার মাইল উপরে উঠে আসছে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত সূর্যের উপরে সবসময় যে কি ভয়ংকর তোলপাড় হচ্ছে তা ধারণা করাও কঠিন।

গ্রহ ও উপগ্রহ

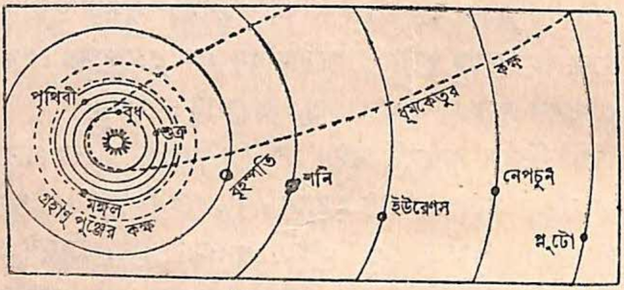
দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে চারদিক্ আঁধার হ'য়ে আসে, আর অন্ধকারে কালো আকাশের গায়ে যেন হাজার হাজার দীপ জ্বলে ওঠে। ওগুলোর মধ্যে ৮টি গ্রহ ও গ্রহাণুপুঞ্জ বাদে বাকি সবগুলোই নক্ষত্র। নক্ষত্রদের নিজেদের আলো আছে। এজন্য বিজ্ঞানীরা সূর্যকেও একটি নক্ষত্র বলেন। আকাশে যেসব নক্ষত্র আছে তাদের মধ্যে অনেকেই সূর্যের তুলনায় অনেক বড় এবং তেজোময় কিন্তু সূর্যের তুলনায় অনেক দূরে থাকায় তাদের এত ছোট দেখায়।

গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো এদের গায়ে পড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়। সেই ছড়ানো আলোর কিছু অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আঁধার ঘরে একটা আয়না রাখ, কিছুই দেখতে পাবে না; কারণ এ-থেকে কোনো আলো বেরোয় না। একটা প্রদীপ জ্বালো, দেখবে, এ-থেকে আলো বেরোচ্ছে। সামনে আয়নাটা রাখ, প্রদীপের আলো তার গায়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই আয়নাটা দেখা যাচ্ছে। সূর্যও একটা বিশাল দীপের মতো জ্বলছে আর গ্রহগুলো তারই আলো যেন আয়নার মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাই আমরা গ্রহদের উজ্জ্বল রূপ দেখতে পাই।

নক্ষত্রদের থেকে গ্রহদের চেনবার উপায় কি? নক্ষত্র সর্বদাই যেন মিটমিট করছে ব'লে মনে হয়, কিন্তু গ্রহ স্থিরভাবে উজ্জ্বল আলো দেয়, মিটমিট করে না।

এই পৃথিবীটাও একটা গ্রহ। একটা লাট্টু যেমন ঘোরে, পৃথিবীও তেমনি ক্রমাগত ঘুরছে। একবার ঘুরতে লাগে চব্বিশ ঘণ্টা, তা হ'তে আমরা রাত আর দিন বুঝতে পারি। পৃথিবী কি শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পাক খাচ্ছে? মোটেই না, এভাবে পাক খেতে খেতে সে আবার নির্দিষ্ট কক্ষ-পথে সূর্যের চারদিকে

ঘুরছে। তাইতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতু প্রকাশ পাচ্ছে। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে লাগে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন বা এক বছর। এক বছর পরে তাই ঋতুগুলো আবার পর পর ফিরে আসে। অন্যান্য গ্রহগুলোও পৃথিবীর মতো পাক খাচ্ছে এবং সূর্যের চারদিকে।নিজ নিজ কক্ষ-পথে ঘুরছে।



চিত্র ৩৪—সৌরজগৎ

সূর্যের সবচেয়ে কাছে যে গ্রহ আছে তার নাম হল বুধ, তারপর শুক্র এবং তারপর পৃথিবী। অন্যান্য গ্রহগুলোর কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের



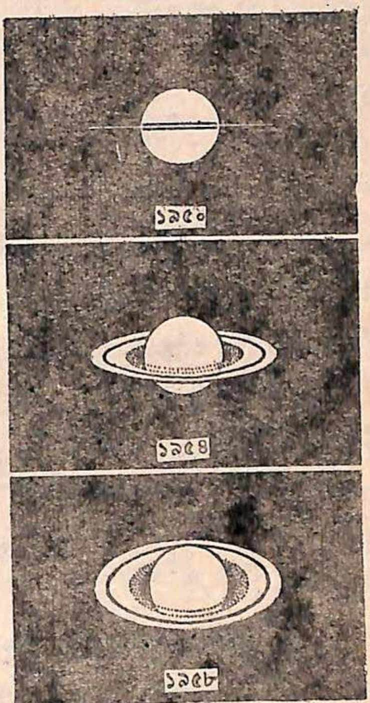
সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন

চিত্র ৩৫

বাইরে। পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে একদিকে আছে শুক্র এবং আর একদিকে মঙ্গল। কাজেই খালি চোখেও এই গ্রহ দু'টি সহজেই চেনা

যায়। শুক্র কিছুদিন পুব আকাশে 'শুকতারা'-রূপে এবং কিছুদিন পশ্চিম আকাশে 'সাঁজের তারা'-রূপে দেখা দেয়। মঙ্গল আপন কক্ষ-পথে ঘুরতে ঘুরতে দু'বছর পরে একবার পৃথিবীর খুব কাছে আসে। তখন একে বেশ লালচে ও জ্বলজ্বলে দেখায়।

মঙ্গলের পরে আছে গ্রহাণুপুঞ্জ, অর্থাৎ ছোট ছোট কয়েক হাজার গ্রহকণিকার সমষ্টি। এরপর আছে বৃহস্পতি, গ্রহদের মধ্যে যার আয়তন এবং ওজন সবচেয়ে বেশি। সূর্যের তুলনায় বিভিন্ন গ্রহের আয়তন খুবই কম (পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দেখ)। বৃহস্পতির পরে যে গ্রহটি আছে, তার নাম শনি। দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয়, শনিকে বেষ্টন ক'রে আছে পর পর সুন্দর তিনটি বলয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বলয় সরু বা মোটা দেখায়। শনির পরে আছে ইউরেনস, নেপচুন ও প্লুটো।



শনি-বলয়ের বিভিন্ন অবস্থান
চিত্র ৩৬

পৃথিবী যেমন নিষ্প্রভ, অন্যান্য গ্রহগুলোও সেরকম। সুদূর অতীতে এরা জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডের মতো ছিল, কিন্তু ক্রমশ ঠাণ্ডা হ'য়ে এরকম কঠিন ও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে। বর্তমানে সূর্যের আলোকেই এদের উজ্জ্বল দেখায়। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে গাছপালা, জনপ্রাণী ইত্যাদি আছে কিনা এই নিয়ে এককালে

বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলত ; কিন্তু যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় অন্য কোনো গ্রহে পৃথিবীর মতো গাছপালা বা জনপ্রাণী থাকা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ ঘুরছে। চাঁদ তার উপগ্রহ। কোনো গ্রহের একটি, আর কোনো গ্রহের অনেকগুলো উপগ্রহ আছে—যেমন, মঙ্গলের ছ'টি, বৃহস্পতির বারোটি, শনির ন'টি, ইউরেনসের পাঁচটি এবং নেপচুনের ছ'টি উপগ্রহ আছে। অন্যান্য গ্রহদের কোনো উপগ্রহ নেই।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক

দিন ও রাত্রি প্রকাশ হওয়ার কারণ:

প্রতিদিন আমরা দেখি, ভোরবেলা পুব আকাশে সূর্য উদিত হ'ল, সারা দিন ধ'রে ধীরে ধীরে আকাশপথে এগিয়ে গেল এবং দিনের শেষে পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল। এভাবে দিন ও রাত্রির প্রকাশ হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, তাই তা পুবদিক্ থেকে উঠে পশ্চিমদিকে যায়। আসলে কিন্তু তা হয় না। বিজ্ঞানীরা এখন প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সূর্য স্থির আছে, আর পৃথিবী একটা লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে, তাই এরূপ দেখা যাচ্ছে।

আমরা বলি, দূরের ঐ গাছ কিংবা বাড়ি স্থির রয়েছে। এর অর্থ কি? গাছ বা বাড়ি নিজের স্থান ত্যাগ করে না, বরাবর একই জায়গায় থাকে। আবার যখন বলব, গাড়িটি গতিশীল, তখন বুঝতে হবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি তার স্থান পরিবর্তন করছে। গতি এবং স্থিতির অবস্থাটা কিন্তু আপেক্ষিক, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের অবস্থার উপর। ধরা যাক, একটি রেলগাড়ির মধ্যে

অনেক যাত্রী বসে রয়েছে এবং গাড়িটি দ্রুতবেগে একটি স্টেশন অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। একটি কামরার জানালা-দরজা সবকিছু বন্ধ, বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এ কামরার একজন যাত্রীর কাছে মনে হবে, অন্যান্য যাত্রী, গাড়ি প্রভৃতি সবই যেন স্থির আছে, কেউই স্থান পরিবর্তন করছে না। কিন্তু আসলে তো গাড়ি ও যাত্রী সবই দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে! স্টেশনের কোনো পর্যবেক্ষক একথা সহজেই বুঝতে পারবে। কিন্তু এসময় কোনো যাত্রী হঠাৎ গাড়ির জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালে দেখতে পাবে, গাড়িটি যেন স্থির রয়েছে আর স্টেশনের বাড়িটা যেন দ্রুতবেগে পেছনদিকে সরে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যাত্রীটি যা দেখছে তা হ'ল স্টেশনের আপেক্ষিক গতি, এ গতি যাত্রীর নিজস্ব গতির উলটো। পৃথিবী একটা লাট্টুর মতো পশ্চিম থেকে পুবে পাক খাচ্ছে, তাই পৃথিবী থেকে আমরা সূর্যের এরূপ আপেক্ষিক গতি দেখতে পাই, আমাদের মনে হয়, সূর্যই যেন পুবদিকে উঠে পশ্চিমদিকে অস্ত যাচ্ছে। কাজেই এ ধারণাটা ভুল। পৃথিবী লাট্টুর মতো ঘুরছে, এভাবে একবার ঘুরতে লাগে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা, এর নাম পৃথিবীর **আহ্নিক-গতি**।

যে সময়ে পৃথিবীর এক অর্ধাংশে সূর্যকিরণ পড়ছে, সেখানে হচ্ছে **দিন**। অপর অর্ধাংশ তখন সূর্যের বিপরীত দিকে রয়েছে, সেখানে



চিত্র ৩৭

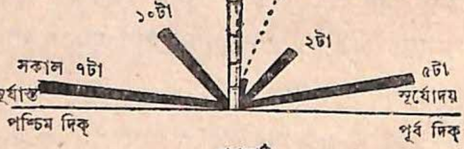
সূর্যকিরণ পড়ছে না ব'লে হচ্ছে রাত্রি। টেবিলের উপর একটা বাতি

রেখে একটা ভূ-গোলক ঘুরিয়ে পরীক্ষা করলে সহজেই বোঝা যাবে কিভাবে দিন ও রাত্রির প্রকাশ হচ্ছে।

ঋতু পরিবর্তন হওয়ার প্রকৃত কারণঃ

১। **দিন-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি**—তোমরা জান, আলোর সামনে কোনো জিনিস রাখলে আলোর উলটোদিকে তার ছায়া পড়ে। তেমনি সূর্যকিরণের পথেও কোনো জিনিস থাকলে সূর্যের উলটোদিকে তার ছায়া পড়বে।

উঠানের মাঝখানে একটা কাঠি ঠিক খাড়াভাবে পুঁতে প্রতিদিন তার ছায়া পর্যবেক্ষণ করবে। সকাল বেলায় সূর্য থাকে পুব আকাশে, কাজেই তখন সবকিছুর ছায়া পড়ে পশ্চিমদিকে, আর সেই ছায়া হয় সবচেয়ে লম্বা। ক্রমে বেলা যত বাড়তে থাকে এ ছায়াও তত ছোট হ'তে থাকে। ঠিক দুপুর বারোটায় এ ছায়া হয় সবচেয়ে ছোট।

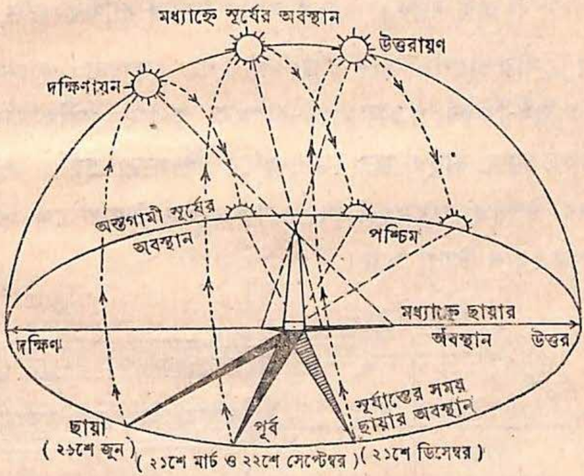


চিত্র ৩৮—কাঠির ছায়া

এরপর সূর্য ক্রমশ পশ্চিমদিকে হেলতে থাকে, তার ফলে ছায়াও ক্রমশ বড় হ'তে থাকে এবং পুবদিকে সরতে থাকে। সূর্যাস্তের সময় ছায়া আবার লম্বা হয় এবং পুবদিকে পড়ে।

এরপর প্রতিমাসে পয়লা তারিখে ঠিক দুপুর বারোটায় কাঠিটার ছায়া মেপে ছকের আকারে লিখে রাখবে। দেখবে, প্রতিমাসে এ ছায়ার মাপ এক-সমান হবে না, আর এ ছায়া কখনও থাকবে কাঠির উত্তরে আবার কখনও থাকবে তার দক্ষিণে। এর কারণ,

প্রতিমাসে মধ্যাহ্নে সূর্য আকাশের ঠিক একই জায়গায় থাকে না। আরও লক্ষ্য করলে দেখবে, প্রতিমাসে আকাশের একই জায়গায় সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হয় না। ডিসেম্বর মাসে সূর্য অনেকটা দক্ষিণ ঘেঁষে উদিত হয়। সেসময় দক্ষিণের বারান্দায় রোদ আসে, আর দিনের চেয়ে রাত বড় হয়। এর নাম সূর্যের দক্ষিণায়ন। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য সবচেয়ে দক্ষিণে সরে উদিত হয়। জুন মাসে দেখবে, অনেকটা উত্তরে সরে সূর্যোদয় হচ্ছে। তখন আর দক্ষিণের বারান্দায় রোদ আসে না এবং সেসময় দিনের চেয়ে রাত ছোট



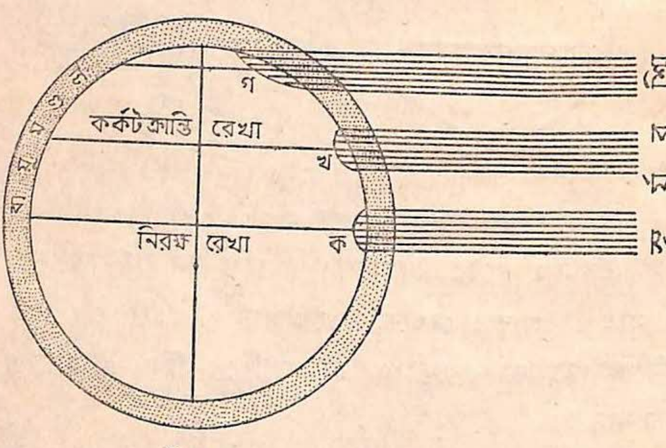
চিত্র ৩৯—বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের আপাত-গতি ও স্তম্ভের ছায়া

হয়। এর নাম সূর্যের উত্তরায়ণ। ২১শে জুন সূর্য সবচেয়ে উত্তরে সরে যায়। আবার দেখবে, ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর সোজা পুবদিকে সূর্যোদয় হয়। এ দুই তারিখে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্য এক-সমান হয়।

পৃথিবী যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাট্টুর মতো পাক খেত, তাহ'লে প্রতিদিন এক জায়গায় সূর্যোদয় হ'ত। পৃথিবী নিজের

মেরুরেখার উপর পাক খেতে খেতে আবার নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, আর পৃথিবীর মেরুরেখা পৃথিবীর কক্ষতলের উপর সামান্য হেলে রয়েছে—তাই সূর্যকে সরে সরে উদিত হ'তে দেখা যায়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ কখনও সূর্যের কাছে আসে বা দূরে সরে যায়। এর ফলে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। টেবিলের উপর বাতি ও ভূ-গোলক রেখে পরীক্ষা করলে সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের কারণ সহজেই বোঝা যাবে। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একবার ঘুরে আসতে লাগে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন বা এক বছর। এরই নাম পৃথিবীর বার্ষিক-গতি।

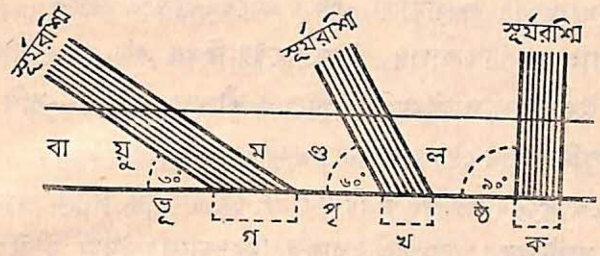
২। **সৌরতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি**—পৃথিবীর কোনো স্থানের উপর লম্বভাবে সূর্য-কিরণ পড়লে সূর্য-রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাবার আগে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুর স্তর ভেদ ক'রে আসতে হয়। এর ফলে সেস্থানের উপরস্থ বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপ শোষণ করবে, তাই ভূপৃষ্ঠ বেশি উত্তপ্ত হবে।



চিত্র ৪০

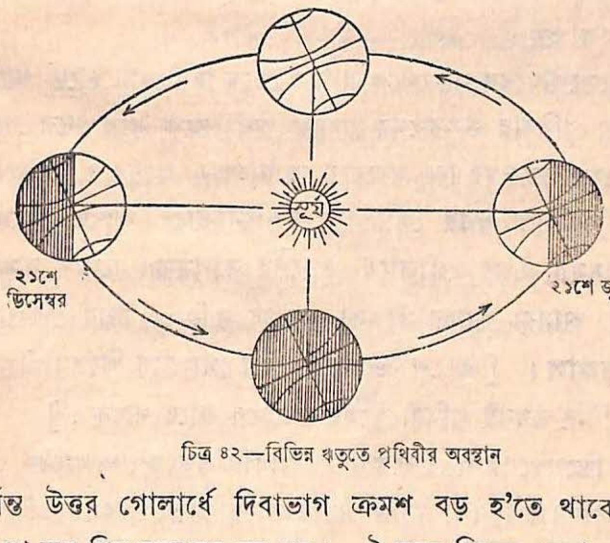
আবার দেখা যায় যে, লম্বভাবে সূর্য-কিরণ পড়লে প্রতি বর্গক্ষেত্র-

পরিমিত স্থানের উপর উত্তাপের তীব্রতা বেশি হয়। লম্বভাবে পড়লে নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্য-কিরণ যতটা জায়গায় পড়বে, হেলানো অবস্থায় সেই পরিমাণ সূর্য-কিরণ আরও বেশি জায়গা জুড়ে পড়বে। কাজেই পরের তুলনায় আগের জায়গায় বেশি উত্তাপ অনুভূত হবে।



চিত্র ৪১

৩। ঋতু-চক্র—২১শে মার্চ তারিখের পর থেকে পৃথিবীর উত্তর-মেরু ক্রমশ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন



চিত্র ৪২—বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর অবস্থান

পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিবাভাগ ক্রমশ বড় হ'তে থাকে। শেষে ২১শে জুন দিন সবচেয়ে বড় হয়। ঐ সময় দিনের বেলা ভূপৃষ্ঠ যতটা

তাপ শোষণ করে রাত্রিবেলা তার সবটা বিকিরণ ক'রে আবার ঠাণ্ডা হ'তে পারে না, কিছুটা তাপ অবশিষ্ট থেকে যায়। এ ছাড়া তখন পৃথিবীর এই অংশে সূর্য-কিরণ লম্বভাবে পড়তে থাকে। এ দু'টো কারণে ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন তারিখ পর্যন্ত রোজই উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা একটু ক'রে বাড়তে থাকে। এসময় উত্তর গোলার্ধে **গ্রীষ্মকাল**। [আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ১লা জুলাই তারিখ উত্তর গোলার্ধে যদিও গ্রীষ্মের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি, কিন্তু তখনই পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে।]

২১শে জুনের পর থেকে দিন ক্রমশ ছোট হ'তে আরম্ভ করে কিন্তু ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্বপর্যন্ত রোজই দিবাভাগের দৈর্ঘ্য রাত্রির চেয়ে বড় থেকে যায়। শেষে ২২শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাত্রি সমান হয়। এসময় গরম থাকলেও দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমশ কমে যায় ব'লে উত্তাপটা তত তীব্রভাবে অনুভূত হয় না। এসময়কে **শরৎকাল** বলা হয়।

২২শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে রাত্রির চেয়ে দিন ছোট হ'তে থাকে এবং এসময় পৃথিবীর উত্তর-মেরু ক্রমশ সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ২১শে ডিসেম্বর দিন সবচেয়ে ছোট হয়। সূর্যের দক্ষিণায়নের জন্য তখন সূর্যরশ্মি উত্তর গোলার্ধে হেলানোভাবে পড়তে থাকে। কাজেই এসময় উত্তর গোলার্ধে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে এবং আমরা শীতের তীব্রতা অনুভব করি। উত্তর গোলার্ধে এসময় **শীতকাল**। [৩১শে ডিসেম্বর উত্তর গোলার্ধে শীতের তীব্রতা খুব বেশি, কিন্তু তখনই পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে।]

২১শে ডিসেম্বরের পর থেকে দিন আবার বড় হ'তে থাকে এবং ২১শে মার্চ পুনরায় দিন ও রাত্রি সমান হ'য়ে যায়। এসময় দিনের চেয়ে রাত্রি বড় থাকে ঠিক কিন্তু এ প্রভেদটা ক্রমশ কমে যায় ব'লে

শীতের তীব্রতাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এসময়কে **বসন্তকাল** বলা হয়।

বলা বাহুল্য, উত্তর গোলার্ধের মতো দক্ষিণ গোলার্ধেও পর্যায়ক্রমে এসব ঋতুগুলোর আবির্ভাব হয়। তবে উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল, আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।

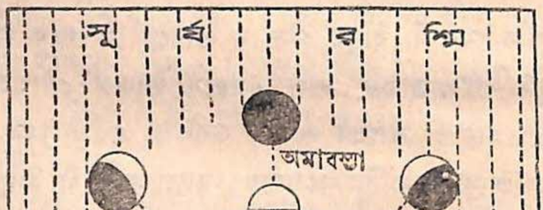
পৃথিবীতে প্রধান ঋতু হু'টি—গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্ম থেকে শীতে পরিবর্তন হওয়ার মাঝে দেখা দেয় শরৎকাল, আবার শীত থেকে গ্রীষ্মে পরিবর্তন হওয়ার মাঝে দেখা দেয় বসন্তকাল। ভারতে এ ছাড়া আরও হু'টি ঋতুর আবির্ভাব হয়—একটি বর্ষা, অন্যটি হেমন্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে মে থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এসময়ে ভারতে গ্রীষ্মের প্রখরতা কিছুটা কমে যায়। কাজেই ভারতে বর্ষাকাল একটি পৃথক্ ঋতু ব'লে গণ্য হয়। আবার কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মৌসুমী বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক্ থেকে প্রবাহিত হয় ব'লে সেসময় ভারতের জলবায়ু শুষ্ক হ'য়ে পড়ে, তাই তখন থেকেই একটু একটু শীতের আমেজ বোঝা যায়। একেই হেমন্তকাল বলা হয়। এজন্য ভারতে মোট ছ'টি ঋতু দেখা দেয়,—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ হু'মাস গ্রীষ্মকাল, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষাকাল, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎকাল, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্তকাল, পৌষ ও মাঘ শীতকাল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র এ হু'মাস বসন্তকাল।

চন্দ্র

পূর্ণিমার রাতে পুব আকাশে যখন চাঁদ ওঠে, তখন তার সুন্দর রূপ দেখে কার না ভালো লাগে! এমনকি ছোট খোকাটিও হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ধরতে চায়, কিন্তু চাঁদকে ধরা কি এতই সোজা?

চাঁদ আছে আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে—দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল (৩,৮২,৪০০ কিলোমিটার) দূরে। অবশ্য সূর্যের তুলনায় চাঁদ রয়েছে যেন আমাদের ঘরের কাছে। যে এরোপ্লেনে চড়ে সূর্যে পৌঁছাতে লাগবে প্রায় ৩৫ বছর ৫ মাস, তাতে ক'রে চাঁদে পৌঁছাতে লাগবে মাত্র ৩৩ দিন ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (চিত্র ৩২ দ্রষ্টব্য)।

চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। তাহ'লে আমরা জ্যোৎস্নার আলো পাই কোথা থেকে ? সূর্য একটা বিশাল দীপের মতো জ্বলছে ব'লে তা থেকে জোরালো আলো বেরোচ্ছে। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে লেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তার যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তাকেই আমরা 'চাঁদের জ্যোৎস্না' বলি।



অমাবস্যা পূর্ণিমা ইত্যাদি তিথি

চিত্র ৩৪

আর-একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। পূর্ণিমার চাঁদ

গোলাকার, কিন্তু তারপর প্রত্যেক তিথিতেই (যেমন প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ইত্যাদি) চাঁদ কিছুটা ক'রে ছোট হ'তে হ'তে কাস্তের মতো সরু হ'য়ে যায় এবং অমাবস্যার রাতে তাকে একেবারেই দেখা যায় না। আবার যত দিন যায় চাঁদ তত বড় হ'তে থাকে এবং প্রায় এক মাস পরে আর এক পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদকে আবার গোলাকার দেখা যায়। এর কারণ কি ? সূর্যের আলোয় চাঁদের যে অংশ আলোকিত হয় তার সবটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে না। প্রতিমাসে পূর্ণিমার রাতেই শুধু পৃথিবী থেকে চাঁদের আলোকিত অংশ সবটা দেখা যায়। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কাজেই তার অবস্থান অনুসারে এই আলোকিত অংশ কখনও কম আবার কখনও বেশি দেখা যায়।

প্রতি রাতে চাঁদের যে অংশ বাড়ে বা কমে, তাকে বলে **চন্দ্রকলা**। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে তিথি বিচার করা হয়, যেমন—প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি। পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত হ'ল কৃষ্ণপক্ষ, আর অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত হ'ল শুক্লপক্ষ। এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যার সময়ের ব্যবধান প্রায় ২৯½ দিন। একে বলা হয় **চান্দ্রমাস**। এই সময়ে চাঁদ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়, এর নাম কলঙ্ক। দূরবীণ দিয়ে দেখলে বুঝবে, চাঁদের গা'টা মোটেই সমতল নয়, উঁচু-নীচু, অনেক বড় বড় পাহাড় আর গর্তে ভর্তি। এককালে যে এখানে অনেক আগ্নেয়গিরি ছিল তা বেশ বোঝা যায়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যেসব গলিত ধাতব পদার্থ উপরদিকে ছিটকে উঠেছিল, তা আজও জমাট বেঁধে রয়েছে। তাই চাঁদের এমন চেহারা! পাহাড়-পর্বতের মাঝে যেসব বড় বড় গর্ত আছে তাতে সূর্যের আলো যেতে পারে না ব'লে ঐ রকম কালো দেখায়।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এ তো সবাই জানে। আর-একটা মজার কথা শোন, চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের উপরও ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো বরাবর চাঁদের একটা দিকই দেখতে পাই, এর কারণ কি? বিজ্ঞানী হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন, পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে চাঁদের যতটুকু সময় লাগে, ঠিক সেসময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের উপরও একবার পাক খায়। তাই চাঁদের একটা দিকই সবসময় পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। চাঁদের আর একপিঠে কি আছে তা আজও আমরা দেখতে পাইনি।

যদি কোনোরকমে চাঁদে গিয়ে হাজির হ'তে পার, তাহ'লে কি দেখবে জান? দেখবে, চাঁদ একটা পাহাড়-পর্বতে ভরা ঠাণ্ডা মরুভূমির মতো—তাতে জল নেই, বাতাস নেই, গাছপালা, জনপ্রাণী কিছুই নেই। পৃথিবীর তুলনায় চাঁদ অনেক ছোট। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। চাঁদের ওজন কম ব'লে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক কম। কাজেই পৃথিবীতে যা খুব ভারি তাও চাঁদে খুব হালকা মনে হবে, যেমন পৃথিবীতে যার ওজন ছ'মণ, চাঁদে গেলে তার ওজন হবে মাত্র এক মণ। সেখানে গিয়ে শরীরটাও হঠাৎ খুব হালকা ব'লে মনে হবে। পৃথিবীতে ৪ ফুট লাফানোই কঠিন, কিন্তু ওখানে গিয়ে অনায়াসে ১৫।১৬ ফুট উঁচু দেওয়াল লাফিয়ে পার হওয়া যাবে।

প্রশ্নমালা

১। সূর্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

১। দিন ও রাত্রি প্রকাশ হওয়ার কারণ কি বুঝাইয়া দাও।

৩। ঋতু পরিবর্তন হওয়ার কারণ কি বুঝাইয়া দাও।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যাহা জান লিখ :—

(ক) সৌরকলঙ্ক, (খ) শুকতারা, (গ) পৃথিবীর আহ্নিক-গতি,
(ঘ) চন্দ্রকলা, (ঙ) নক্ষত্র।

৫। চন্দ্রের জ্যোৎস্না হয় কিরূপে? চন্দ্রের কলা সম্পর্কে আলোচনা কর। চন্দ্রের কলঙ্ক বলিতে কি বুঝ?

৬। গ্রহ এবং নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি? আকাশে যেসব গ্রহ দেখা যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। শুদ্ধ উত্তরের পার্শ্বে (√)-চিহ্ন দাও ; অপরগুলিতে (×)-চিহ্ন দাও।

(i) চন্দ্র একটি গ্রহ
উপগ্রহ
নক্ষত্র।

(ii) সূর্য একটি গ্রহ
উপগ্রহ
নক্ষত্র।

(iii) শুক্র একটি গ্রহ
উপগ্রহ
নক্ষত্র।

(iv) পৃথিবী এক জায়গায় স্থির আছে
সূর্যের চারদিকে ঘুরছে
চন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে।

(v) একটি কাঠির ছায়া সবচেয়ে ছোট হয় সকালে
সন্ধ্যায়
মধ্যাহ্নে।

(vi) চন্দ্রের আলো আছে, কারণ—
সেখানে অনেক জীব আছে, তারা আলো জেলে রাখে
চন্দ্রের নিজস্ব আলো আছে
সূর্যের আলোকে উহা আলোকিত।

(vii) ২১শে জুন দিবাভাগ সবচেয়ে বড়
সবচেয়ে ছোট
রাত্রির সমান ।

(viii) ৩১শে ডিসেম্বর শীতের তীব্রতা বেশি, কারণ—
এই সময় সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে
এই সময় পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে
এই সময় দিনের চেয়ে রাত্রির দৈর্ঘ্য বেশি ।

(ix) সূর্যই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কারণ—
তাহা সবচেয়ে বড়
তাহা সবচেয়ে উজ্জ্বল
তাহা সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত ।

৮। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(i) সূর্যকেই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল — ব'লে মনে হয়।

(ii) শুক্র কিছুদিন পূব আকাশে — রূপে এবং কিছুদিন পশ্চিম আকাশে — — রূপে দেখা দেয়।

(iii) দূরবীণ দিয়ে দেখলে মনে হয়, শনিকে বেষ্টন ক'রে আছে তিনটি —।

(iv) চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো দাগ আছে, এর নাম —।

(v) রঙিন কাচে ঢাকা দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের গায়ে অনেক — দেখা যায়।

৯। একটি শব্দ কিংবা বাক্যাংশ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(i) পৃথিবীর চেয়ে সূর্য — গুণ ভারি।

(ii) সূর্যের আয়তন পৃথিবীর — গুণ।

(iii) পৃথিবীর আয়তন চাঁদের — গুণ।

(iv) পৃথিবী থেকে সূর্য প্রায় — মাইল দূরে রয়েছে।

(v) পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় — মাইল।

(vi) — দিনে চাঁদ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

দ্বিতীয় পর্ব

জীবের কথা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীব ও জড় পদার্থের তুলনা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল পদার্থের সংস্পর্শে আসি তাদের প্রধানত দু'টো ভাগে ভাগ করা যায়।

গাছপালা, গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি যাদের চেতনা আছে, তাদের বলা হয় **সচেতন পদার্থ** বা জীব ; আর মাটি, পাথর, সোনা, লোহা ইত্যাদি যাদের চেতনা নেই, তাদের বলা হয় **অচেতন পদার্থ** বা **জড়-পদার্থ**। অনেকগুলো বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়কেই জীবজগতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জীবের বৈশিষ্ট্য কি? এ সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হ'ল।

(১) **খাদ্যগ্রহণ**—জীবমাত্রেই খাদ্য দেহসাৎ ক'রে বেঁচে থাকে এবং আকারে বড় হয়, কিন্তু জড়-পদার্থ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং তার দেহের কোনো পুষ্টি হয় না। টবে একটা গাছ লাগালে দেখবে, তা ডালপালা ছড়িয়ে ক্রমশ আকারে বড় হয়। গাছ মাটি এবং বায়ু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য থেকে তার দেহের পুষ্টি হয়, তার নূতন নূতন পাতা, ফুল ও ফল হয়, সেগুলো ঝ'রে পড়ে, আবার নূতন ক'রে পাতা, ফুল ও ফল দেখা দেয়। পরীক্ষা ক'রলে দেখবে, টবে নিয়মিতভাবে সার না দিলে গাছ বড় হয় না। সার হ'ল গাছের খাদ্য। একটি বেড়াল-ছানা বা কুকুর-ছানা

যে নিয়মিতভাবে খাদ্য গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকে এবং ক্রমশ আকারে বড় হয় তাও সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। খেতে না দিলে এরা অল্পদিনের মধ্যেই মরে যাবে।

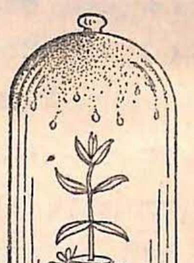
(২) **শ্বাসকার্য**—উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই বেঁচে থাকার জন্য শ্বাসক্রিয়া অপরিহার্য। শ্বাসকার্যের সময় জীবদেহে অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। শ্বাসকার্যের জন্য যে বায়ুর অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা নীচের পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়।



চিত্র ৪৪

পরীক্ষাঃ (i) একটি ইঁদুরকে বেল্‌জার চাপা দিয়ে রেখে দাও। বেল্‌জারের ধারগুলোয় এমনভাবে মোম লাগিয়ে দাও যাতে বাইরের বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে। কয়েক ঘণ্টা পরে দেখবে, বায়ুর অক্সিজেনের অভাবে ইঁদুরটি দমবন্ধ হ'য়ে মরে গেছে।

(ii) একটি ছোট টবের গাছ একটি বেল্‌জার দিয়ে চাপা দিয়ে রাখ। কয়েকদিন পরে দেখবে, মুক্ত-বায়ুর অভাবে শ্বাসক্রিয়া চালাতে না পেরে তাও মরে গেছে।

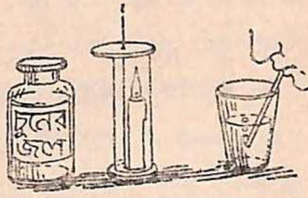


চিত্র ৪৫

জীবের শ্বাসকার্যের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় তা নীচের পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়।

পরীক্ষাঃ (i) একটা গেলাসে পরিষ্কার চুনের জল নিয়ে একটা নলের সাহায্যে ক্রমাগত ফুঁ দিতে থাক। দেখবে, অল্পক্ষণ

পরেই চুনের জল ঘোলা হ'য়ে যাবে। চুনের জল ঘোলা ক'রে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের বিশেষত্ব। কাজেই প্রমাণ হ'ল যে, আমাদের শ্বাসকার্যের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।



চিত্র ৪৬

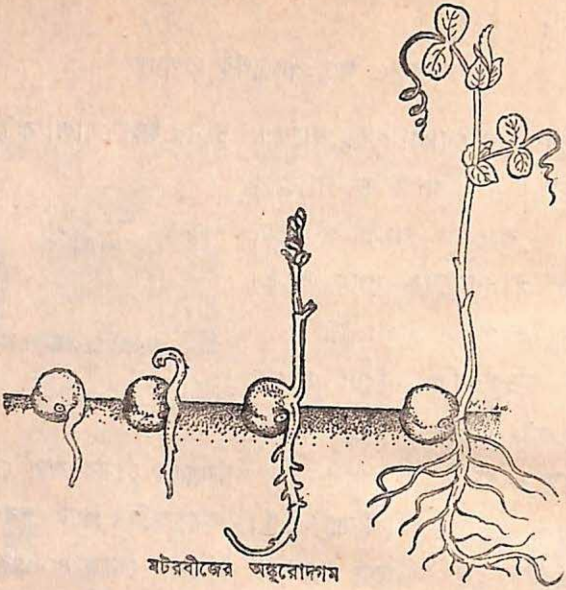
(ii) কতকগুলি কেঁচো সংগ্রহ ক'রে একটি কাচের পাত্রে রাখ। ঐ পাত্রের মধ্যে একটি পরখ-নলে খানিকটা চুনের জল রেখে দাও (চিত্র ৪৭)। কয়েকদিন পরে দেখবে, চুনের জল ঘোলা হ'য়ে গেছে। এর কারণ, কেঁচোর শ্বাসকার্যের ফলে পাত্রের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে।



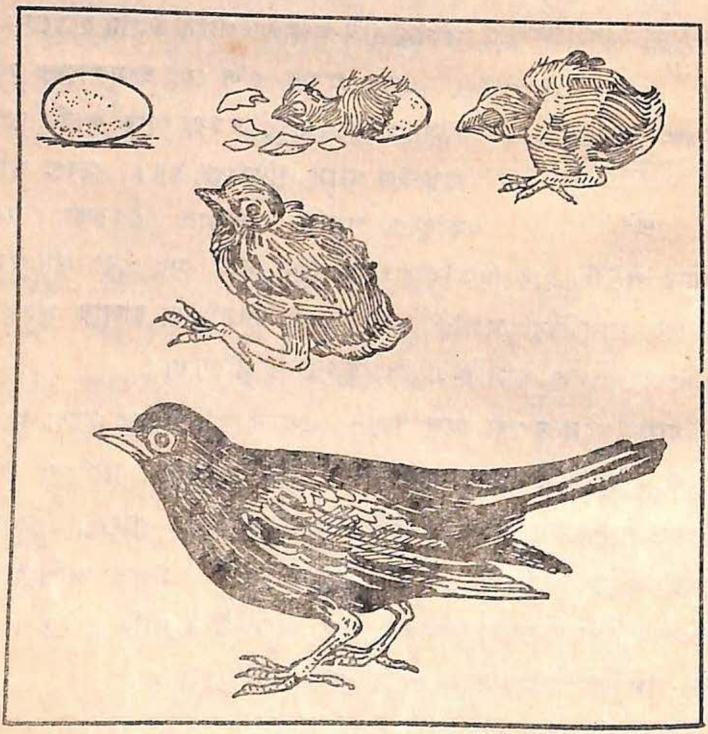
চিত্র ৪৭

এতে প্রমাণ হ'ল যে, শ্বাসকার্যের সময় বায়ুর অক্সিজেন গৃহীত হয়, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য শ্বাস-কার্যের পদ্ধতি সকলের একরকম নয়। স্থলচর প্রাণীরা নাক দিয়ে বায়ুর অক্সিজেন টেনে নেয় এবং ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। আর মাছ শ্বাসক্রিয়া চালায় ফুলকার সাহায্যে। গাছ শ্বাসক্রিয়া চালায় পাতার সাহায্যে।

মানুষ জলে ডুবলে মরে যায়। এর কারণ, জলের মধ্যে মানুষ শ্বাসকার্য চালাতে পারে না। কিন্তু মাছ ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। কোনো আবদ্ধ পাত্রে মাছ রেখে দিলে দেখবে, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব হ'লে মাছগুলো জলের উপরে ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে এবং শ্বাসক্রিয়া চালাতে না পেরে শেষপর্যন্ত মরে যায়।



চিত্র ৪৮



চিত্র ৪৯—পাখির ডিম থেকে বাচ্চার জন্ম এবং ক্রম-পরিবর্তন

(৩) **বংশবিস্তার**—জীব নানা উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। উদ্ভিদ্ থেকে যে বীজ পাওয়া যায়, তা মাটিতে পুঁতে দিলে নূতন চারাগাছ জন্মায়। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখি ডিম দেয়, ডিম ফুটে যে বাচ্চা হয় তাই ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ পাখিতে পরিণত হয়। আবার কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণিমাত্রেরই বাচ্চা হয়। এমনি ক'রে নূতন জীবের সৃষ্টি করতে পারে ব'লেই জীবের বংশধারা বজায় থাকে। কিন্তু জড়-পদার্থ বংশবিস্তার করতে পারে না।

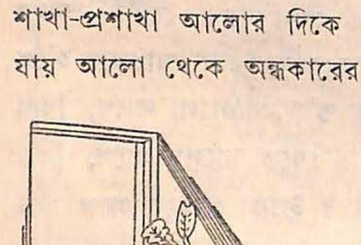
(৪) **উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা**—সকল জীবেরই প্রাণ এবং চেতনা আছে, তা ছাড়া অনেকেরই বুদ্ধি আছে। জড়-পদার্থের প্রাণ, চেতনা কিংবা বোধশক্তি নেই।

জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। প্রাণীদের দেহে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আছে, যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। আমরা চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিই, জিব দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করি এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শের জ্ঞান লাভ করতে পারি। নানারূপ উত্তেজনায় নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন—সুমধুর গান হ'তে থাকলে আমরা কান পেতে শুনি, উৎকট আওয়াজ হ'লে আমরা কানে হাত দিই। ফুলের গন্ধ শুঁকতে ভালো লাগে, কিন্তু দুর্গন্ধ শুঁকলে নাক চেপে ধরি। মিষ্টি খেতে ভালো লাগে, কিন্তু তেতো খেতে খারাপ লাগে। আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিই। গায়ে চিমটি কাটলে ব্যথা লাগে, আবার কাতুকুতু দিলে শুড়শুড়ি লাগে। অন্যান্য প্রাণীও উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।

পরীক্ষা: দিনের বেলায় ঘরের মধ্যে খানিকটা গুড়, পাকা আম বা পাকা কাঁটাল রেখে দাও। খানিকক্ষণ পরে দেখবে, দলে দলে মাছি এসে তার উপর বসছে। এতেই বোঝা যায়, মাছির ঘ্রাণশক্তি কেমন প্রখর।

কেঁচো শুকনো দিনে মাটির নীচে থাকে, আর বর্ষাকালে মাটির উপরে এসে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যা আগুন দেখলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার আগুন দেখলে হিংস্র প্রাণীরা ভয় পায়, তাই বনে থাকতে হ'লে শিকারীরা আগুন জ্বালিয়ে রাখে। সামান্য শব্দ শুনলেই হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি সেদিকে কান খাড়া ক'রে থাকে, আর বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই দৌড়ে পালায়। হরিণ, খরগোশ প্রভৃতি বন্য প্রাণী দূর থেকে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর গায়ের গন্ধ পেলেই দৌড়ে পালায়। আলপিন দিয়ে খোঁচা দিলে আমরা যেমন ব্যথা পাই, তেমনি গাড়ির গোরু কিংবা হালের গোরুকে খোঁচা দিলে তারা তাড়াতাড়ি যায়। চাবুক মারলে ঘোড়া তাড়াতাড়ি ছোটে। আবার অঙ্কুশের গুঁতো দিয়ে মাহুত হাতী চালায়।

উদ্ভিদের দেহে কোনো ইন্দ্রিয় নেই। তবুও উদ্ভিদের নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। যেমন, গাছের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা আলোর দিকে এগিয়ে যায়, আর শিকড় এগিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। উদ্ভিদ্ শিকড়ের সাহায্যে মাটির রস শোষণ করে, এজন্য গাছের শিকড় সর্বদাই জলের উৎসের দিকে এগিয়ে যায়।

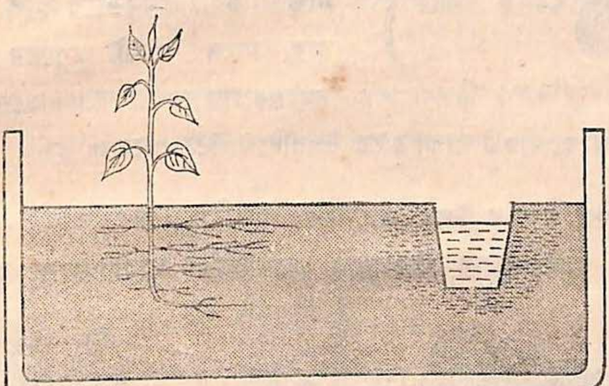


চিত্র ৫০

পরীক্ষা ঃ (i) জলপূর্ণ একটা কাচের জারের মুখে কর্কের সাহায্যে একটা সরষের চারা বসিয়ে দাও। এবার একটা ঘরের একটামাত্র জানালা খুলে রেখে তার কাছে জারটি রেখে দাও। কয়েকদিন পরে দেখবে, কাণ্ড

জানালার দিকে এগিয়ে গেছে এবং মূল আলো থেকে দূরে আঁধারের দিকে এগিয়ে গেছে।

(ii) বালুকাপূর্ণ একটা টবের একপাশে একটি চারা গাছ আছে। অন্যপাশে ছিদ্রযুক্ত একটি পাত্র আছে। এই পাত্রটির ভিতর দিয়েই শুধু জল সরবরাহ করবে। তাহ'লে দেখবে, যেদিক থেকে জল আসছে শিকড়গুলি লম্বা হ'য়ে সেদিকে বেড়ে গেছে। এর কারণ সেখান থেকেই তার খাদ্য পাবার সম্ভাবনা বেশি।

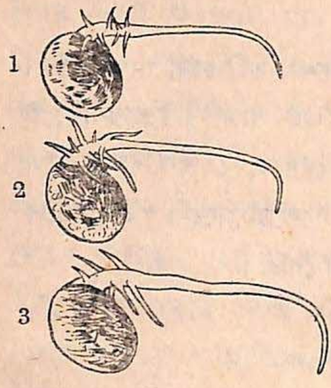


চিত্র ৫১

পুকুর-পাড়ের গাছের শিকড় পরীক্ষা করলেও দেখবে, গাছের শিকড় ভেজা মাটির দিকেই বেশি বেড়ে গেছে।

আর-একটা মজার কথা শোন। উদ্ভিদের উপরে পৃথিবীর টানের অর্থাৎ অভিকর্ষেরও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, গাছের শিকড় মাটির নীচের দিকে, অর্থাৎ ভূকেন্দ্রের দিকে বৃদ্ধি পায়। আবার গাছের কাণ্ড মাটি থেকে দূরে অর্থাৎ ভূকেন্দ্রের বিপরীত দিকে এগিয়ে যায়।

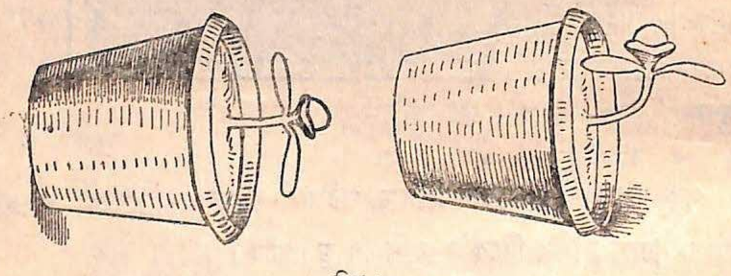
পরীক্ষা ঃ (i) একটি অঙ্কুরিত শিমের বীজ নাও এবং তাকে ভিজে মাটির উপর এমনভাবে আটকে রাখ যাতে তার শিকড় ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে। কয়েকদিন পরে দেখবে, এর শিকড় বাঁকা হ'য়ে মাটির দিকে নেমে গেছে।



চিত্র ৫২

(ii) একটা টবে-বসানো গাছ নাও। টবটি এমনভাবে কাত ক'রে রাখ, যাতে গাছটি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে। কয়েকদিন পরে দেখবে, গাছটি বাঁকা হ'য়ে উপরদিকে উঠে গেছে।

বিভিন্ন গাছের উপর তাপেরও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এজন্য কোনো গাছ জন্মায় শীতপ্রধান দেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, আবার



চিত্র ৫৩

কোনো গাছ জন্মায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরম আবহাওয়ায়। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও গাছের চেহারা বদলে যায়। তাই দেখা যায়, শীতের সময় অনেক গাছেরই পাতা ঝরে গেছে, আবার বসন্তকালে সেসব গাছ নূতন পাতায় ছেয়ে গেছে। এসময় শাল,

শিমুল, কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। বনভূমি এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে।

দুর্বল কাণ্ডকে লতা বলে। লতা দু'রকম। দূর্বা ঘাস, রাঙা আলু ইত্যাদি কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে যায়। আবার মটর, শিম, লাউ, কুমড়ো, পান ইত্যাদির কাণ্ড কোনো আশ্রয়কে অবলম্বন ক'রে উপরে ওঠে।

পরীক্ষা ঃ (i) একটি শিমের চারার পাশে একটি কাঠি পুঁতে রেখে দাও। কিছুদিন পরে দেখবে, লতা গাছটি কাঠিটিকে জড়িয়ে ধরে উপরদিকে উঠেছে।

(ii) একটি লাউ গাছের চারার পাশে একটি কাঠি পুঁতে রেখে দাও। কিছুদিন পরে দেখবে, এই গাছের কাণ্ড থেকে কতগুলি



শিম গাছ লাউ গাছ লজ্জাবতী লতা

চিত্র ৫৪

আকর্ষ বেরিয়েছে এবং তাদের সাহায্যে কাঠিটি আঁকড়ে ধরে লাউগাছ উপরদিকে উঠেছে।

কোনো কোনো গাছের ফুল দিনের আলোতে মেলে কিন্তু

রাত্রিবেলা বন্ধ হ'য়ে যায়। লজ্জাবতী লতা এত স্পর্শকাতর যে, তার ডালের কোথাও স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলো মুড়ে যায়, জোরে আঘাত দিলে সম্পূর্ণ ডালটাই ঝুলে পড়ে। এও একরকমের প্রতিক্রিয়া।

(৫) জীবের জন্ম ও মৃত্যু—জীবের জন্ম ও মৃত্যুর কথা সহজেই জানা যায়। জড়-পদার্থের জন্ম ও মৃত্যুর কথা কিছুই বোঝা যায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, চেতনা জড়-পদার্থকে আশ্রয় না ক'রে থাকতে পারে না, কিন্তু চেতনা ছাড়াও জড়ের অস্তিত্ব সম্ভব। যেমন, একটি জীবিত গাছের ভেতরে জড় ও চেতনা যুক্তভাবেই রয়েছে। কিন্তু এ গাছটি কেটে ফেললে যে কাঠ পাওয়া যায় তা শুধুই জড়-পদার্থ, তাতে চেতনা নেই।

জীব ও জড়-পদার্থের তুলনা

জীব	জড়-পদার্থ
১। খাদ্য গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি সাধন করে ও আকারে বড় হয় ;	খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না এবং দেহের কোনো পুষ্টি হয় না।
২। শ্বাসকার্য দ্বারা কাজ করবার শক্তি পায়, এর ফলেই অনেকের দেহ গরম থাকে ;	শ্বাসকার্যের ক্ষমতা নেই।
৩। জীব নানা উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে ;	বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।
৪। সকল জীবেরই প্রাণ এবং চেতনা আছে, তা ছাড়া অনেকেরই বুদ্ধি আছে ; জীবমাত্রেই উদ্দীপনায় সাড়া দেয় ;	প্রাণ, চেতনা, কিংবা বোধশক্তি নেই ; উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে না।
৫। জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর কথা সহজেই জানা যায়। মৃত্যুর পর জীব-দেহ জড়-পদার্থে পরিণত হয় ;	জন্ম, মৃত্যু কিছুই বোঝা যায় না।

প্রশ্নমালা

১। জীব কাহাকে বলে? জীব ও জড়-পদার্থের প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

২। শ্বাসকার্য কি? পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও। মাছ কিরূপে শ্বাসক্রিয়া চালায়?

৩। উদ্ভিদ্ কিরূপে উদ্দীপনায় সাড়া দেয়? কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। "জীবমাত্রই উদ্দীপনায় সাড়া দেয়"—একথা বলিতে কি বুঝা যায়? প্রাণীরা কিভাবে উদ্দীপনায় সাড়া দেয়, কয়েকটি উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও।

৫। যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পার্শ্বে '$\surd$'-চিহ্ন দাও :—

(i) জড়-পদার্থ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।
জীবমাত্রই উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।

(ii) উদ্ভিদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা আলোর দিকে এগিয়ে যায়।
উদ্ভিদের মূল আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

(iii) উদ্ভিদের শিকড় এগিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে।
উদ্ভিদের কাণ্ড এগিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারের দিকে।

(iv) স্তন্যপায়ীরা ডিম পাড়ে।
হাঁস, মুরগী প্রভৃতি ডিম পাড়ে।

(v) জড়-পদার্থ নানা উপায়ে বংশবিস্তার করতে পারে।
জীব নানা উপায়ে বংশবিস্তার করতে পারে।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মাছ জলে দ্রবীভূত — সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে।

(খ) জড়ের — নেই, কিন্তু সকল জীবেরই — আছে।

(গ) উদ্ভিদের দেহে কোনো — নেই, তবুও উদ্ভিদের নানাপ্রকার — সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে।

(ঘ) উদ্ভিদ্ — সাহায্যে মাটির — শোষণ করে।

(ঙ) শ্বাসকার্যের সময় জীবদেহে — গৃহীত হয় এবং — পরিত্যক্ত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর তুলনা

সাদৃশ্য

(১) জন্মের পর এরা নানারকম খাদ্য দেহসাৎ ক'রে আকারে বড় হয়।

(২) শ্বাসক্রিয়ার ফলে শক্তি লাভ করে। এতে বাতাসের অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়।

(৩) উভয়েই নানা উপায়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

(৪) উভয়েই উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।

(৫) প্রাণীরা মল, মূত্র ইত্যাদির সঙ্গে দেহের আবর্জনা দূর করে, গাছপালাও নানা উপায়ে দেহের অবাঞ্ছিত পদার্থ বের ক'রে দেয়।

পার্থক্য

উদ্ভিদ্	প্রাণী
১। কতকগুলো উদ্ভিদ্ সচল হ'লেও সাধারণভাবে উদ্ভিদ্ চলতে পারে না কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারে না।	প্রাণিমাত্রই সচল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারে।
২। দেহের আকৃতিতে কোনো সামঞ্জস্য নেই, অর্থাৎ দেহের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। দেহের সকল অংশ একতালে বড় হয় না; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-কোনো দিকে নূতন নূতন ডালপালা, মূল প্রভৃতি জন্মাতে পারে।	দেহের আকৃতিতে বেশ সামঞ্জস্য আছে, অর্থাৎ দেহের আকার নির্দিষ্ট, এবং দেহের সকল অংশ একতালে বড় হয়। এজন্য বাচ্চা প্রাণী দেখতে বড় প্রাণীটির মতোই হয়; যেমন—মানুষ, কুকুর, বেড়াল, গোরু, ঘোড়া ইত্যাদি।

পার্থক্য

উদ্ভিদ্	প্রাণী
৩। কোনো উদ্ভিদেরই চোখ, কান, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয় থাকে না।	বেশির ভাগ প্রাণীরই এসব ইন্দ্রিয় থাকে এবং এসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দিতে পারে।
৪। শ্বাসক্রিয়ার জন্য কোনো পৃথক্ যন্ত্র থাকে না, পাতার ছিদ্রপথে এই কাজ চলে।	সাধারণত পৃথক্ যন্ত্র থাকে।
৫। শুধু তরল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।	সাধারণত তরল ও কঠিন সবরকম খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে।
৬। প্রত্যক্ষভাবে জড়-পদার্থ থেকেই দেহের পুষ্টিসাধন করতে পারে।	জড়-পদার্থের সাহায্যে দেহের পুষ্টিসাধন করতে পারে না, কাজেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়।
৭। বেশির ভাগ উদ্ভিদের দেহেই সবুজকণা আছে ব'লে তারা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে অঙ্গার-আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ঘটিত খাদ্য তৈরি করতে পারে।	দেহে সবুজকণা থাকে না, কাজেই নিজেরা ঐ উপায়ে কোনোরূপ খাদ্য তৈরি করতে পারে না।
৮। মাটির রসের সঙ্গে যেসব লবণ-জাতীয় উপাদান গ্রহণ করে, তা দিয়ে নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য (প্রোটিন) তৈরি করতে পারে।	নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্যের (প্রোটিনের) জন্য উদ্ভিদ্ অথবা কোনো প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয়।

প্রশ্নমালা

১। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য কি তাহা বুঝাইয়া দাও।

২। (ক) খাদ্যগ্রহণ প্রণালীর দিক হইতে একটি গাছ এবং একটি ঘোড়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

(খ) আকৃতির দিক হইতে একটি গাছ এবং একটি ঘোড়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(i) — দেহের কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই, কিন্তু — দেহের আকার নির্দিষ্ট।

(ii) উদ্ভিদের দেহে — নেই, কিন্তু প্রাণীর দেহে বিভিন্ন — আছে।

(ii) প্রাণীদের খাদ্যের জন্য একান্তভাবে — উপরই নির্ভর করতে হয়।

(iv) উদ্ভিদ্ শুধু — খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।

(v) — প্রত্যক্ষভাবে জড়-পদার্থ থেকেই দেহের পুষ্টিসাধন করতে পারে, কিন্তু — তা পারে না।

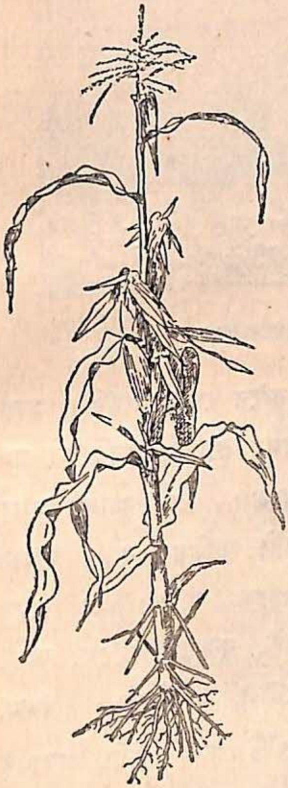
সপ্তম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি উপকারী উদ্ভিদের কথা

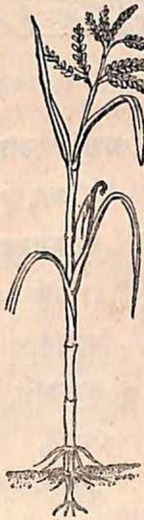
মানুষের জীবনে উদ্ভিদ্ খুবই প্রয়োজনীয়। যেসব উদ্ভিদ্ আমাদের নানা কাজে লাগে, তাদের বলা হয় উপকারী উদ্ভিদ্। সব-রকম উদ্ভিদ্ই যে আমাদের কাজে লাগে তা নয়। যেসব উদ্ভিদ্ আমাদের অনিষ্ট করে, তাদের বলা হয় অপকারী উদ্ভিদ্।

উদ্ভিদ্ তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবগুলো উপাদানই সোজাসুজি জড়-জগৎ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। এদের সাহায্যেই উদ্ভিদ্-দেহের পুষ্টি হয় এবং খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ উদ্ভিদ্-দেহে সঞ্চিত থাকে। প্রাণিমাত্রেই জল, লবণ ও অক্সিজেন ছাড়া আর কোনো কিছুই জড়-জগৎ থেকে সোজাসুজি গ্রহণ করতে পারে না। গোরু, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি সবুজ ঘাস-পাতা ইত্যাদি খায়। মাংসাশী প্রাণী অন্য কোনো প্রাণীর দেহ খেয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু সেসব প্রাণীর আহার যোগায় উদ্ভিদ্। তাই প্রাণীদের প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা

পরোক্ষভাবেই হোক খাদ্যের জন্য একান্তভাবে উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করতে হয়।



চিত্র ৫৫—গম

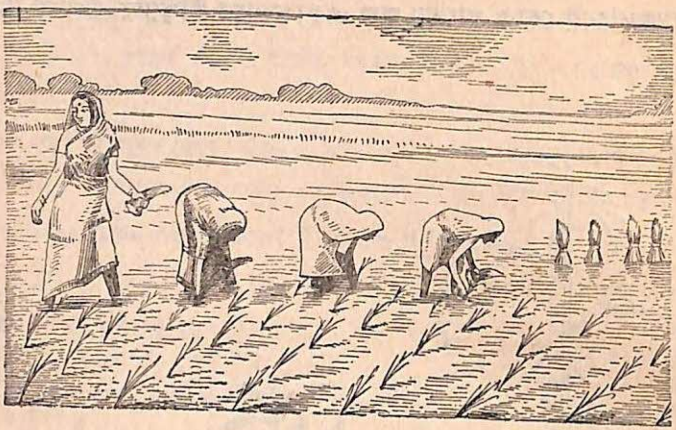


চিত্র ৫৬—ভুট্টা



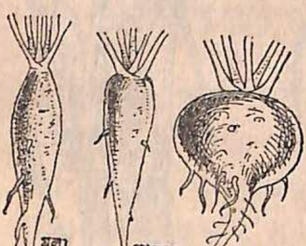
চিত্র ৫৭—ধান

আমাদের খাদ্যের সর্বপ্রধান উপকরণ হ'ল চাল বা আটা। এগুলো পাওয়া যায় ধান, গম ও যব থেকে। এজন্য সব দেশেই এসব খাদ্য-শস্যের চাষ করা হয়। মটর, ছোলা, মুসুরি প্রভৃতির বীজ থেকে নানাপ্রকার ডাল তৈরি হয়। আমাদের দেশে ডালও খাদ্যের একটি প্রধান উপকরণ। আবার শাক-পাতা কাঁচা খেতে না পারলেও



চিত্র ৫৮—খেতে ধানের চারা লাগানো হচ্ছে

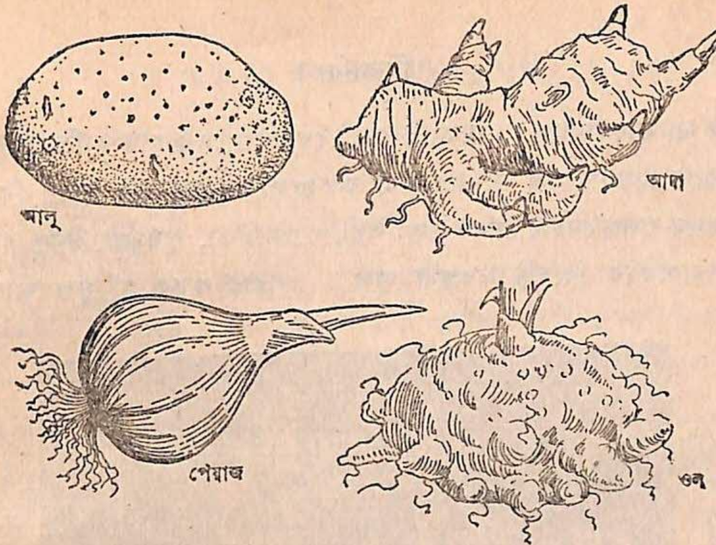
বাঁধাকপি, পালং, ডাঁটা প্রভৃতি রান্না ক'রে খেতে পারি। মূলা, গাজর, শালগম প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল আমাদের খাদ্য। ওল, আদা, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি ভূনিম্নস্থ কাণ্ড আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। এ ছাড়া ফুলকপি, লাউ, কুমড়া, পেঁপে, কলা, বেগুন, পটোল, ঝিঙ্গে, শিম, টমেটো, মটরশুঁটি প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য তরকারি।



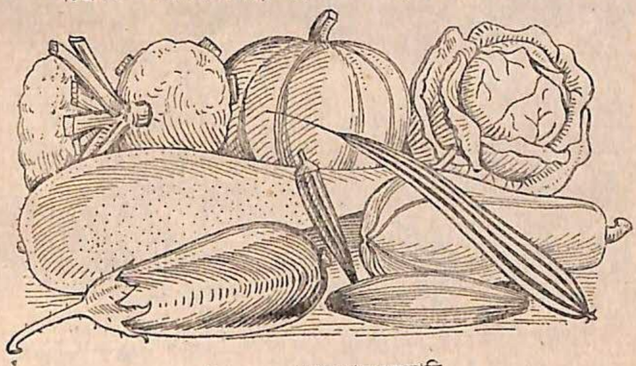
চিত্র ৫৯—কয়েকপ্রকার উদ্ভিদের মূল

পাকা ফল সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য। আম, জাম, কাঁটাল, কলা, পেয়ারা, আপেল, কমলালেবু, আঙ্গুর, নারকেল, আনারস প্রভৃতি ফলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শুধু খাদ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই যে গাছ লাগানো হয়, তা নয়। অনেকেই বাগান ক'রে সেখানে নানাবিধ ফুলের গাছ লাগান। ফুল



চিত্র ৬০—কয়েকপ্রকার ভূনিম্নস্থ কাণ্ড—আলু, আদা, পেঁয়াজ, ওল

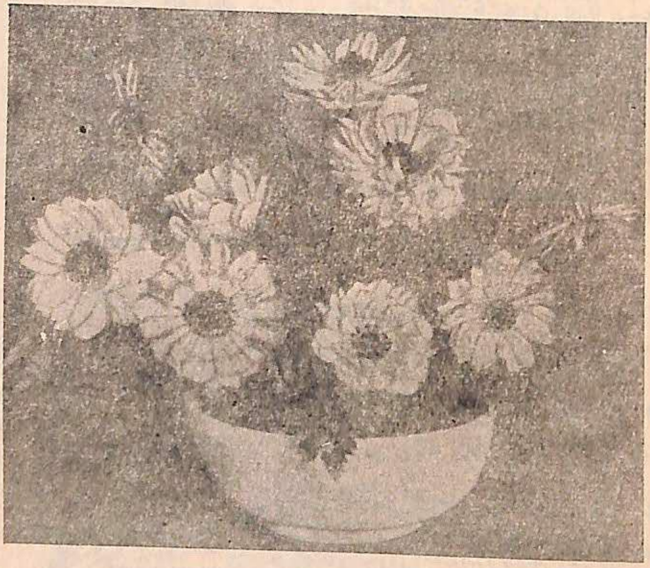


চিত্র ৬১—নানাপ্রকার তরকারি



চিত্র ৬২—নানাপ্রকার ফল

কে না ভালোবাসে ! এমনকি ছোট যে শিশু সেও হাত বাড়িয়ে ফুল ধরতে চায়। ফুল নানাপ্রকার, কতগুলো দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু তেমন সুগন্ধ নেই ; যেমন—ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, গাঁদা এবং নানাপ্রকার বিদেশী মরশুমী ফুল। আবার কতগুলো ফুল আছে



চিত্র ৬৩—ঘরে কয়েকটি ফুল সাজিয়ে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য বেড়ে যায়

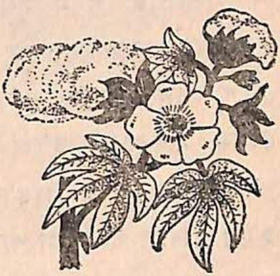
যেগুলো সুমিষ্ট গন্ধের জন্য বিখ্যাত ; যেমন—গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেল, জুঁই, হাসনুহানা ইত্যাদি। ঘরে সামান্য কয়েকটি ফুল সাজিয়ে রাখলেই ঘরের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। মাদ্রাজ ও জাপানের মেয়েরা ফুল খুব ভালোবাসে, তাই তাদের প্রসাধনের একটা প্রধান উপাদান হ'ল ফুল। ফুল এত সুন্দর, তাই আমরা পূজো করার সময় দেবতার পায়ে ফুলের অর্ঘ্য দেই।

বড় বড় গাছের ডাল বা কাণ্ড থেকে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়।

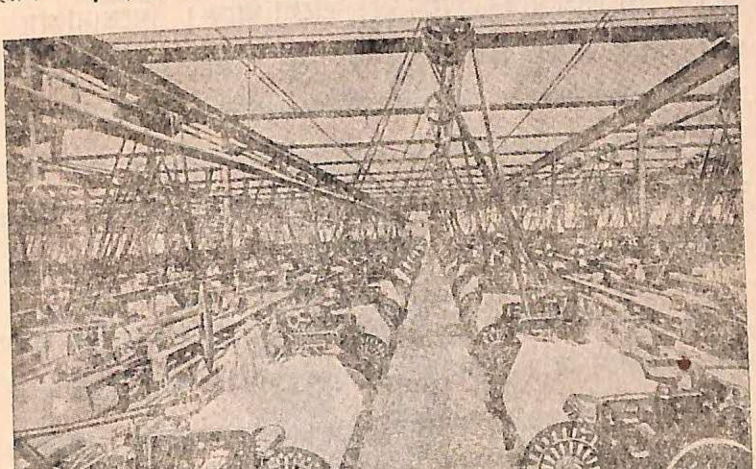
আমাদের দেশে জ্বালানি হিসেবে আম, জাম, তেঁতুল প্রভৃতির কাঠই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। শাল, সেগুন, আবলুস, কাঁটাল প্রভৃতির কাঠ দিয়ে ঘরের দরজা, জানালা, নানাপ্রকার আসবাব প্রভৃতি তৈরি করা হয়। আর প্যাকিং বাক্স, দেশলাই-কাঠি প্রভৃতি তৈরি করা হয় শিমুল, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি গাছের কাঠ দিয়ে। বাঁশ দিয়ে কাগজ তৈরি করা হয়, তা ছাড়া ঘর-বাড়ি তৈরি করতেও বাঁশের প্রয়োজন হয়। খড় (শুষ্ক তৃণ) দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়।



চিত্র ৬৪



চিত্র ৬৫—কার্পাস তুলো



চিত্র ৬৬—কাপড়ের কল (cotton mill)

আমাদের বস্ত্রাদি তৈরি করা হয় কার্পাস তুলো দিয়ে। পাটগাছের কাণ্ডের আবরণ থেকে যে আঁশ পাওয়া যায়, তাও আমাদের অনেক কাজে লাগে। এ দিয়ে চট, থলে, দড়ি প্রভৃতি তৈরি হয়। শণগাছের আঁশ দিয়ে এবং নারকেলের ছোবড়া দিয়েও খুব মজবুত দড়ি তৈরি করা যায়।

সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই মানুষ নানাপ্রকার গাছপালার সাহায্যে নানাপ্রকার ওষুধ তৈরি করতে শিখেছে। এভাবে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বা কবিরাজী চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। যেমন, সর্দি-কাশি হ'লে আদা ও তুলসী পাতার রস কিংবা বাসক পাতার রস খেলে উপকার হয়। পেটের অসুখ বা আমাশয় রোগ হ'লে গাঁদাল পাতা বা থানকুনি পাতার রস খেলে কিংবা বেল খেলে তা সেরে যায়। চর্মরোগ হ'লে নিম পাতা দিয়ে তা সারানো যায়। নিমের ডাল দিয়ে দাঁতন করলে দাঁত ভালো থাকে। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে এরূপ অনেক উপকারী উদ্ভিদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। বলা বাহুল্য, এসব মহদুপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন মানুষের রোগ-শোক দূর ক'রে দীর্ঘজীবন লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

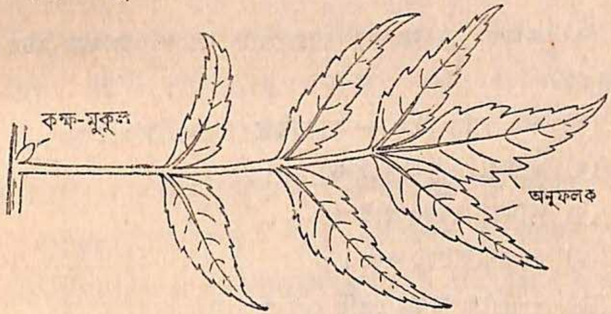
এ ছাড়া আরও নানাভাবে গাছপালা আমাদের নানাবিধ কাজে লাগে, এখানে তার অতি সামান্যই আলোচনা করা সম্ভব হ'ল। এ-থেকেই বোঝা যাবে, আমরা উদ্ভিদের উপর কতখানি নির্ভরশীল। গাছপালার অপরিসীম দানের কথা ভেবে আমাদের সবসময়ই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং ছেলেবেলা থেকেই গাছপালার যত্ন করতে শেখা উচিত।



চিত্র ৬৭—তুলসী পাতা



চিত্র ৬৮—বাসক পাতা



চিত্র ৬৯—নিম পাতা



চিত্র ৭০—সিঙ্কোনা গাছের পাতা ও ফুল

প্রশ্নমালা

১। উপকারী উদ্ভিদ্ বলিতে কি বুঝায়? কয়েকটি উপকারী উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। (ক) আমাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান কোন্ কোন্ গাছ হইতে পাওয়া যায়?

(খ) কার্পাস তুলো ও পাট আমাদের কোন্ কাজে লাগে?

(গ) আমাদের আসবাবপত্র কি কি গাছের কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হয়?

(ঘ) পল্লীগ্রামে ঘরবাড়ি তৈয়ার করার জন্য কোন্ কোন্ উদ্ভিদের সাহায্য লইতে হয়?

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) আমরা যে মটরের ডাল খাই তা পাওয়া যায় মটর গাছের — থেকে।

(খ) সর্দি-কাশি হ'লে — পাতার রস খেলে উপকার হয়।

(গ) আমরা যে মূলা খাই তা গাছের —।

(ঘ) আমরা যে ওল খাই তা —।

(ঙ) — চর্মরোগের ওষুধ।

(চ) — দিয়ে কাগজ তৈরি করা হয়।

(ছ) আমাদের বস্ত্রাদি তৈরি করা হয় — দিয়ে।

৪। কোন্ কাজের জন্য কোন্ উদ্ভিদের প্রয়োজন লিখ :—

(i) বাঙালীর খাদ্যের প্রধান উপকরণ তৈরি করতে;

(ii) আসবাব তৈরি করতে;

(iii) দেশলাই-কাঠি তৈরি করতে;

(iv) চট, থলে, দড়ি প্রভৃতি তৈরি করতে;

(v) ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তৈরি করতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

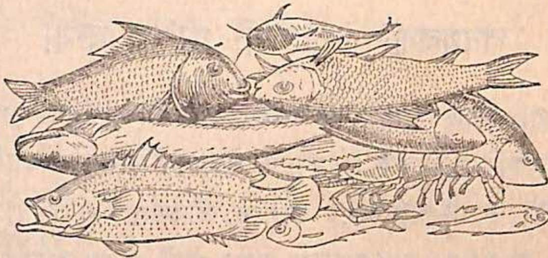
কয়েকটি উপকারী প্রাণীর কথা

এই পৃথিবীতে মানুষ ও নানাপ্রকার জীবজন্তু পাশাপাশি বাস করছে অনেকদিন থেকেই। মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ প্রাণী, সেজন্য এই পৃথিবীটা তারই অধিকারে এসেছে, জীবজন্তুরা সবই আজ মানুষের পদানত। আমাদের আশেপাশে যেসব প্রাণী আছে তাদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যেসব প্রাণী নানাভাবে আমাদের কাজে লাগে, আমাদের উপকার করে, তাদের বলা হয় **উপকারী প্রাণী** ; আর যেসব প্রাণী নানাভাবে আমাদের ক্ষতি বা অপকার করে, তাদের বলা হয় **অপকারী প্রাণী**।

উপকারী প্রাণীগুলি প্রধানত তিনপ্রকারে আমাদের উপকার করে। কতগুলো আমাদের খাদ্য যোগায়, কতগুলো আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ যোগায়, কতগুলো ভারবাহী প্রাণী হিসেবে আমাদের কাজে লাগে। এ ছাড়া এমন কতগুলো পশুপক্ষী আছে, যাদের সহজেই পোষ মানানো যায়। এরাও নানাভাবে আমাদের উপকার করে, অথবা নানাভাবে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আমাদের মনে প্রচুর আনন্দ দেয়।

আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান উপাদান হ'ল মাছ, মাংস অথবা ডিম। এর যে-কোনো একটি নিয়মিতভাবে আহার না করলে শরীরের পুষ্টি হয় না। এজন্য সব দেশেই মাছের চাষ, পশুপালন অথবা হাঁস-মুরগী পালন ক'রে খাদ্যের জন্য এসব সরবরাহ করা হয়। আমাদের দেশে পুকুর বা দীঘিতে রুই, কাতলা, ভেট্‌কি, কই, মাগুর,

সিঙ্গি, ট্যাংরা প্রভৃতি মাছের চাষ করা হয়, আর জেলেরা নদী থেকে ইলিস, চিংড়ি, রুই, কাতলা, আড়, ধাই প্রভৃতি মাছ ধরে



চিত্র ৭১—নানাপ্রকার মাছ

বাজারে বিক্রি করে। এ ছাড়া অনেক দেশেই সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ব্যবস্থা আছে। সব দেশেই পাঁঠা, খাসি, গোরু, ভেড়া, শূকর

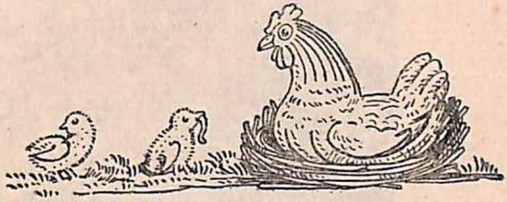


চিত্র ৭২—দুধ অতি প্রয়োজনীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য

প্রভৃতির মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তা ছাড়া ছাগল, গোরু, মোষ প্রভৃতির দুধও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শিশু ও বৃদ্ধদের পক্ষে দুধ একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য। ডিমও একটি পুষ্টিকর খাদ্য, এজন্য সব দেশেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় হাঁস-

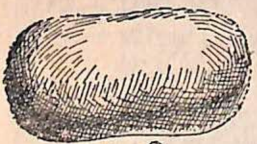
মুরগী পালন করার ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। হাঁস-মুরগীর মাংসও খুব পুষ্টিকর এবং অনেকেই তা খাদ্যরূপে গ্রহণ করেন।

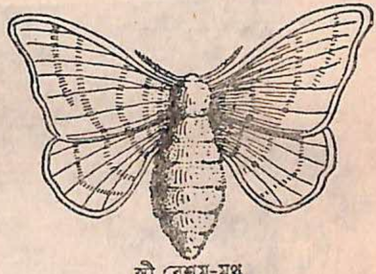

চিত্র ৭৩—হাঁস


চিত্র ৭৪—মুরগী

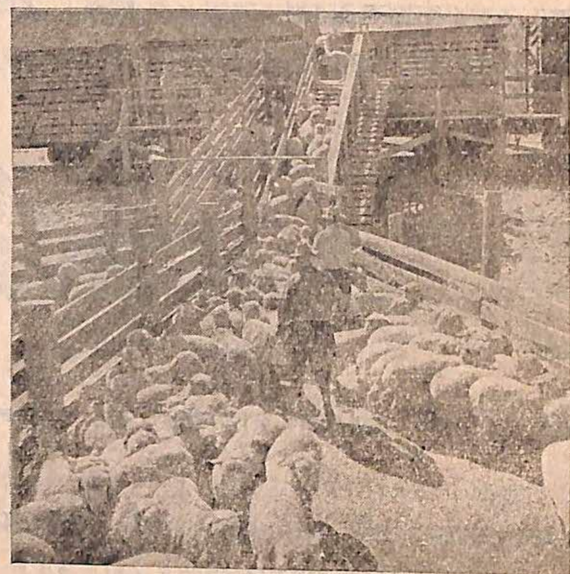
মৌমাছি মধু তৈরি করে এবং লাক্ষাকীট তৈরি করে লাক্ষা বা গালা।

রেশম-মথ রেশমের গুটি তৈরি করে। গুটি থেকে যে রেশম-সুতো পাওয়া যায় তা দিয়ে রেশমের কাপড় তৈরি হয়। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি হয় শীতের কম্বল এবং নানাপ্রকার পশমের


রেশম-গুটি
চিত্র ৭৫


স্ত্রী রেশম-মথ
চিত্র ৭৬

জামা। এজন্য মেষপালন একটি লাভজনক ব্যবসা। পশুর চামড়া দিয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়। একাজে প্রধানত গোরু, ভেড়া, ছাগল, হরিণ প্রভৃতির চামড়া ব্যবহৃত হয়। সাপের ও বাঘের



চিত্র ৭৭—ভেড়ার পাল



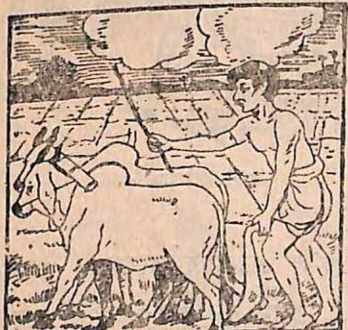
চিত্র ৭৮—তিব্বতী মেয়েরা ভেড়ার লোম (পশম) ছাড়াচ্ছে। পশম দিয়ে তারা কম্বল তৈরি করবে।

চামড়া দিয়েও অনেকে শৌখিন জুতো তৈরি করান। এ ছাড়া পশুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ, স্যুটকেস, শৌখিন জামা-কাপড় প্রভৃতি আরও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয়।



চিত্র ৭৯—পশুর চামড়া দিয়ে আমাদের জুতো তৈরি হয়

সভ্যতার অতি প্রথম যুগ থেকেই মানুষ ভারবহনের উদ্দেশ্যে এবং আরও নানা প্রয়োজনে নানাপ্রকার পশু নিয়োগ ক'রে আসছে।



গোরুর সাহায্যে হালচাষ

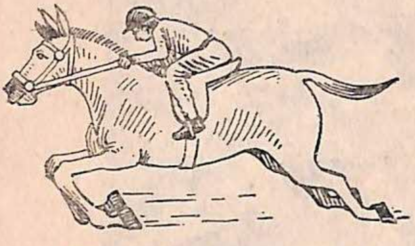


গোরুর গাড়ি

চিত্র ৮০

চাষীরা গোরু বা মোষ দিয়ে লাঙ্গল টানিয়ে হালচাষ করে। গোরু বা মোষের গাড়ি ক'রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া যায়

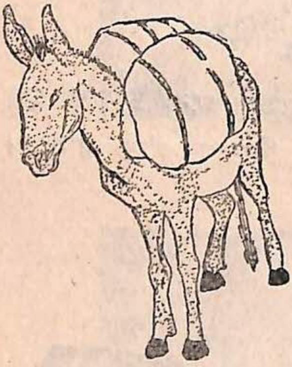
অথবা মাল বহন ক'রে নেওয়া যায়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে অথবা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া যায়। পৃথিবীর অনেক দেশেই গাধা, উট অথবা হাতীর পিঠে ক'রে মাল



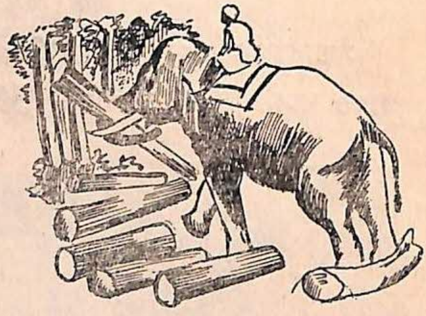
ঘোড়ায় চড়ে সহজেই যাতায়াত করা যায়



ঘোড়ার গাড়ি



ভারবাহী গাধা

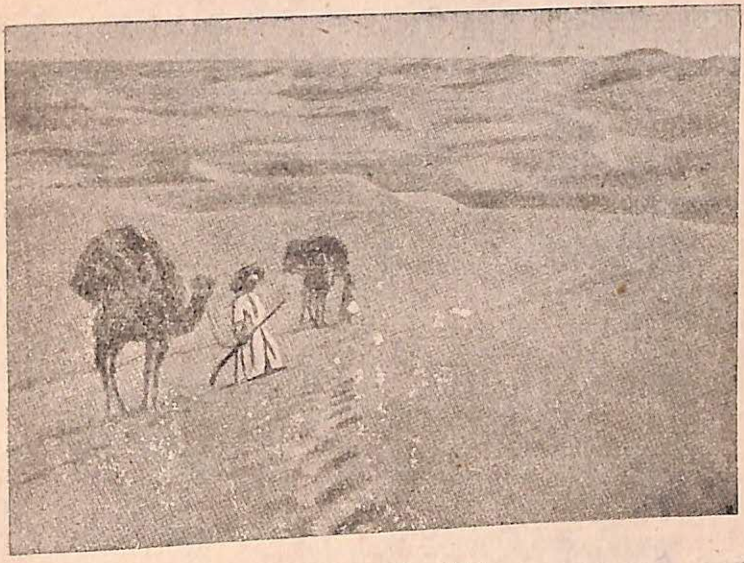


হাতী কাঠ বয়ে নিচ্ছে

চিত্র ৮১

বহন করা হয়। মরুভূমিতে উটই হ'ল একমাত্র বাহন। এজন্য উটকে বলা হয় 'মরুভূমির জাহাজ'। দুর্গম বন থেকে কাঠ কেটে বাইরে বয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন কাজ, হাতীর সাহায্যে এখন একাজ করা অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

অনেকেই নানারকম পশু-পাখী পোষে ; যেমন—কুকুর, বেড়াল, কাকাতুয়া, ময়না, টিয়া, পায়রা ইত্যাদি। কুকুর খুবই প্রভুভক্ত



চিত্র ৮২—মরুভূমির জাহাজ

প্রাণী। এরা আমাদের বাড়ি পাহারা দেয় অথবা মেষচারণ, গোচারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাহারার কাজ করে এবং বন্যপশু শিকারের কাজেও



চিত্র ৮৩—বেড়াল



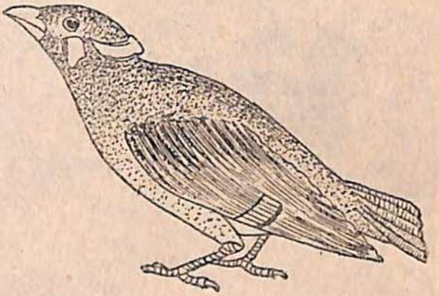
চিত্র ৮৪—কুকুর

অনেক সাহায্য করে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রবল, এজন্য শিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে অনেক সময় খুনী আসামী ধরা সম্ভব হয়। আবার

বরফের দেশে মানুষ কুকুর দিয়ে শ্লেজ-গাড়ি টানায়। বেড়াল ইঁদুর মেরে গৃহস্থের অনেক উপকার করে। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে কাকাতুয়া,



চিত্র ৮৫—টিয়া



চিত্র ৮৬—ময়না

ময়না, টিয়া প্রভৃতি পাখী মানুষের মতো কথা বলে এবং সুমিষ্ট স্বরে শিস্ দেয়। এদের কথা অথবা শিস্ শুনতে খুব ভালো লাগে। একঝাঁক পায়রা যখন আকাশে উড়ে উড়ে নানারকম খেলা দেখায় এবং ডিগবাজী খায় তখন কার না ভালো লাগে! এ ছাড়া যুদ্ধের সময় শিক্ষিত পায়রার সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়।

প্রশ্নমালা

১। উপকারী প্রাণী বলিতে কি বুঝায়? কয়েকটি উপকারী প্রাণী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। (ক) গোরু ও মহিষ আমাদের কি উপকার করে?
(খ) কুকুরকে উপকারী প্রাণী বলা হয় কেন?
(গ) ঘোড়ার উপকারিতা কি?
(ঘ) ভেড়া আমাদের কোন্ কোন্ কাজে লাগে?

৩। একটি শব্দ অথবা বাক্যাংশ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ—

(ক) — লোম দিয়ে পশমের জামা তৈরি হয়।

(খ) মরুভূমিতে — হ'ল একমাত্র বাহন।

(গ) — মাংস এবং ডিম পুষ্টিকর খাদ্য।

(ঘ) রেশমসুতো পাওয়া যায় — থেকে।

(ঙ) আমাদের জুতো তৈরি হয় — দিয়ে।

৪। নিম্নলিখিত প্রাণী হইতে আমরা কি পাই বল ঃ—

(উত্তরগুলি পার্শ্ববর্তী তালিকা হইতে লইবে)

(i) গোরু	ডিম, পশম, দুধ, মধু, রেশম
(ii) মথ	
(iii) হাঁস	
(iv) মৌমাছি	
(v) ভেড়া	

পরিশিষ্ট

১। নিম্নে কতকগুলি জিনিসের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহারা কি, তাহাও পাশে লেখা হইয়াছে, কিন্তু এলোমেলোভাবে। কোন্‌টি কি হইবে, তাহা ঠিকভাবে সাজাইয়া লিখ :—

(i) বায়ু	সচেতন পদার্থ
(ii) সূর্য	গ্রহ
(iii) শুক্র	নক্ষত্র
(iv) চন্দ্র	গ্যাস
(v) কয়লা	ধাতু
(vi) লোহা	উপগ্রহ
(vii) নাইট্রোজেন	মিশ্রণ
(viii) পাথর	পাললিক শিলা
(ix) জল	অচেতন পদার্থ
(x) উদ্ভিদ্	তরল পদার্থ

২। পার্শ্বে কেবল 'হাঁ' কিংবা 'না' লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ঠিক উত্তর দাও :—

(i) অক্সিজেন কি শ্বাসকার্যের সহায়ক ?

(ii) বায়ুর কি ওজন আছে ?

(iii) উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় শ্বাসকার্য চালানো কি সহজ ?

(iv) সমুদ্রের জল কি পানের যোগ্য ?

(v) নলকূপের জল কি পানের যোগ্য ?

(vi) উদ্ভিদ্ কি সচেতন পদার্থ ?

(vii) শ্বাসকার্যের ফলে কি নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় ?

(viii) উদ্ভিদের কি ইন্দ্রিয় আছে ?

(ix) উদ্ভিদের কি উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে ?

(x) কেঁচো কি শ্বাসকার্য চালাতে পারে ?

(xi) সূর্য কি একটি নক্ষত্র ?

(xii) শুকতারা কি একটি গ্রহ ?

(xiii) মহাশূন্যে পৃথিবী কি স্থির আছে ?

(xiv) পৃথিবী কি সব জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে ?

(xv) পৃথিবী কি সূর্যের চেয়ে বড় ?

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর নীচে দেওয়া আছে—যথাক্রমে উত্তর খুঁজিয়া পার্শ্বে লিখ :—

(i) বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প স্ফটিকের আকারে জমে গেলে তাকে বলে —

(ii) শীতের রাত্রে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে ঘাস-পাতার উপর জমে, এর নাম —

(iii) উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় জলীয় বাষ্প জমলে বলা হয় —

(iv) স্বভাবজাত অজৈব বস্তুকে বলা হয় —

(v) সকল জড়-বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এর নাম —

(vi) যে জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো আছে তাকে বলা হয় —

(vii) যে জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলো আয়নার মতো ছড়িয়ে দেয়, তার নাম —

(viii) যার চেতনা কিংবা বোধশক্তি নেই, তাকে বলা হয় —

(ix) দেহে কোনো ইন্দ্রিয় নেই, তবুও নানাপ্রকার উদ্দীপনায় সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে, এরাই হ'ল —

(x) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সোজাসুজি জড়-জগৎ থেকে সংগ্রহ করতে পারে না, এরাই হ'ল —

[উদ্ভিদ্, গ্রহ, প্রাণী, তুষার, শিলা, খনিজ, নক্ষত্র, মহাকর্ষ, জড়-পদার্থ, শিশির]

———